রাণী রাসমণির জীবন চরিত।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক [illegible]প্রেসে মুদ্রিত।

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃতা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী—

উদার রচিতাসু।

মাতঃ—

রাণীরাসমণির নাম শীঘ্র লোপ হইবার নহে। যতদিন কৈবর্ত্ত জাতির নাম থাকিবেক, যতদিন তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্ন থাকিবেক, ততদিন তাঁহার নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইবে। ইহা শীঘ্র যাইবার নহে, শীঘ্র মুছিবার নহে। তথাপি, সময়ের সাংঘাতিক অস্ত্র দেখিয়া, আজ কয়েক বৎসর হইল, আপনার প্রিয়তম বিখ্যাত পুত্র আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও আশ্রয় দাতা মৃত বাবু দ্বারকানাথ বিশ্বাস মহাশয় আমায় রাণীরাসমণির জীবন-রচিত লিখিতে অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের মোকদ্দমার ও দপ্তরখানার অনেক কাগজ পত্র আমায় দিয়াছিলেন। আমি সাতিশয় আগ্রহের সহিত সে সমুদায় অন্বেষণ করিয়া অনেক সংগ্রহ করি। পরে হালিসহর, হুগলী, ভবানী-পুর, খিদিরপুর, বজবজে ও মকীমপুরের অনেক স্থানে স্বয়ং যাইয়া রাসমণির বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে মানস করি। কিয়দংশ লেখা হইলে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত দ্বারি বাবু মানবলীলা সম্বরণ করেন। আমি স্বল্পদিনের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ করিয়া আপনার ও আপনাদের বাটীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট পাঠ করি। আপনারা সকলেই উহা মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। অনেক কারণ বশতঃ এতদিন মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এক্ষণে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আশ্রয়দাতা, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে ও উদ্যোগে আমি ইহার মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই মহানুভব ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ইহার প্রচার বিষয়ে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

মাতঃ! এখন রাসমণিকে যাহাকে দিব, রাসমণি যাহার নিকটই যাইবে, তিনিই তাঁহাকে আদর করিবেন, আশ্রয় দিবেন, সত্য বটে, কিন্তু আপনি যেমন তাঁহার মর্ম্ম বুঝিবেন, তেমন কেহই পারিবেন না। সেইজন্যই অন্য কাহারও নিকট না দিয়া ভক্তিসহকারে রাসমণিকে আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। রাসমণি আপনার মাতা, অতএব আপনি যে তাঁহাকে আদর করিবেন এ বিষয়ে বলা বাহুল্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে রাসমণির নামীয় গীতটী আমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ পক্ষী (দাস) মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়াছি। রূপচাঁদ বাবু একজন বিখ্যাত কবি। এই গীতটী তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন।

মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউসান।
১৫ই ভাদ্র, ১২৮৬ সাল।

স্নেহাস্পদ
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

বিদ্যার জ্যোতিঃ যতই আমাদের দেশে প্রকাশিত হইতেছে, ততই আমাদের সাহিত্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্য আমাদের আর কিছু করুক আর নাই করুক, আমাদিগকে একটী মহৎ উপকার প্রদান করিয়াছে। ইহা আমাদের পরস্পার পরস্পারকে জানিবার ও চিনিবার অনেক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বেই বা আমরা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইব; এসমস্ত জানিবার কি কি উপায় সম্ভবে? কি উপায়েই বা আমরা ভূত ও বর্ত্তমান বিষয় জানিতে পারিব ও জানিয়া তদ্বিষয়ে সদসৎ বিবেচনা করিব? এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইবার নানাবিধ সুচারু উপায় আছে তন্মধ্যে ইতিহাস ও জীবনচরিত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে ইতিহাস ও জীবনচরিত দুইটী বিভিন্ন বিষয়। ইহাদের পরস্পার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। ইতিহাসে দেশস্থ সমস্ত বিষয় বিবৃত থাকে। ইহাতে রাজ্য বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, সংক্ষেপে সমস্তই সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে এত বিষয় বিরচিত হয় যে আমরা কদাচিত তাহাতে উত্তেজিত কিম্বা অনুকম্পিত হই।

ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের স্ব স্ব দৈনিক কার্য্য কলাপের অতি সামান্য সম্বন্ধ দৃষ্টি হয়। ইতিহাস জাতীয় চরিত্র মাত্র। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের চরিত্র চিত্রিত হয়। সুতরাং এতদ্‌পাঠে আমাদের কোন সহানুভুতি হওয়া অপেক্ষা ঐতিহাসিক নীতিশিক্ষা করিবার সমধিক কৌতূহল হয়। কিন্তু জীবনচরিত এক সতন্ত্র পদার্থ। ইহা সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয়, উপকারী ও মনস্তুষ্টিসাধক। ইহাতে আমাদিগকে অতি কৌশলে আমোদ ও নীতি শিক্ষা দেয়। ইহাতে আমাদের দোষ গুণের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। এতদ্‌পাঠে আমাদের মন সাতিশয় উত্তেজিত হয় এবং অবশেষে ইহার অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করি। বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিলে জীবনচরিতে আমাদের সহানুভূতি আছে। নায়কের সুখে আমরা সুখী হই, দুঃখে দুঃখী হই, তাহার আত্মীয় আমাদের আত্মীয়, তাহার বন্ধু আমাদের বন্ধু।

সত্য বটে আমরা অত্যন্ত ব্যগ্রতার ও অত্যন্ত উৎসাহের সহিত রাজ্য সংক্রান্ত, ধর্ম্মনৈতীক, সাংগ্রামিক বিপ্লব, ও জ্ঞান-পূর্ণ বক্তৃতা, পাঠ করি ও সময়ে সময়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হই, কিন্তু একটু ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে এইরূপ লোক সংখ্যা অতি সামান্য। বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজ্যনৈতিক বিষয়ে অতি স্বল্প সংখ্যক লোক মাত্রই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। চাণক্য কিম্বা চেথাম,

রঞ্জিত, ওয়েলিংটন, কিম্বা নেপোলিয়ান বোনাপার্ঠির মত কয়টী লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ইহাদের জীবনচরিত কেবল তৎকালিক ইতিহাস মাত্র। ইহাদের জীবনচরিত অতি উৎকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমার তদভিপ্রায় নহে। আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী,বীর কিম্বা রাজনৈতিক পুরুষদের জীবনচরিত লিখিতে প্রায়াস পাইব না। ইহা আশাতীত না হইলেও আমার মানস না।

ইতিহাস ও জীবনচরিত দুটী সতন্ত্র বিষয় হইলে ও জীবন চরিত যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। সময়ের সাম্যতা ও নায়কের প্রকৃত বৃত্তান্ত রক্ষা করাই জীবন চরিতের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ। চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র দেখিয়া আমরা ইতিহাস লিখিতে পারি কিন্তু জীবনচরিত তাহা নহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র বিষয়। ইহা কেবল নায়কের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশেষ রূপ পরিচিত থাকিলে লেখা যায়; কিন্তু তাহাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। নায়কের যাহা কিছু আমরা জ্ঞাত আছি তাহা ও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। এবং অতি ত্বরাই সমস্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়া যায়। আবার যাহাও জানি তাহাও তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি না; এবং আবার যখন বলিবার যোগ্য হয় তখন প্রায়ই তাহা মনে থাকে না। নায়কের মনের অমিয় সৌন্দর্য্য, স্বভাবের সৌন্দর্য্য এবং অন্যান্য সুন্দর গুণ নিচয় আমরা শীঘ্রই বিস্মৃত হই। যখন জীবনচরিত লিখিতে এতই সঙ্কট, তখন নায়কের সামান্য দোষ সমূহ আলাপে, কথায় বার্ত্তায়, স্বভাবে

যাহাতেই হউক না কেন, বিস্মৃত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে হেতু সামান্য একটু দোষ ধরিয়া আমোদ করিতে করিতে আমরা কোন বিধবা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা ও বন্ধু বর্গের মনে সাতিশয় কষ্ট উৎপাদন করিতে পারি।

কোন্ বিষয় সংগোপন আর কোন্ বিষয়ই বা প্রকাশ করা উচিত ইহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে সত্য বটে, কিন্তু যখন সামাজিক কিম্বা ধর্ম্মনৈতীক সম্বন্ধের সহিত নায়কের স্বকীয় গোপনীয় স্বভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ না থাকে, তখন সামান্য গোপনীয় দোষ সমুহ জনসমাজে প্রচার করিয়া নায়কের নামে কলঙ্ক আরোপন করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। কিন্তু আবার বলিতেছি কেবলই প্রশংসা রাশি স্তুপাকারে ও অজস্র প্রদান করিলে প্রায়ই বিশ্বাস যোগ্য হয় না এবং হয় ত সমস্ত বিষয়ের উপর আমাদের একটী অযথা অবিশ্বাস উৎপাদিত হইতে পারে। যখন মানবমণ্ডলী কখন ও দোষ শূন্য হইতে পারে না। যখন তাহারা ভ্রান্তির আস্পদ। যখন কেহই অহঙ্কারী হইয়া বলিতে পারেন না যে তাহার বিশুদ্ধ স্বভাব, তাহার নামে কলঙ্কের চিহ্ন মাত্র নাই ও হইবার সম্ভাবনাও নাই। তখন দোষের ভাগ বিশেষ সতর্কের সহিত সংগোপন করিয়া তাহার গুণ সমূহ জনসমাজে প্রচার করাই উচিত। ইহাতে দেশের গৌরব, সমাজের উন্নতি, এবং নায়কের প্রশংসা।

সামান্যতঃ ইতিহাসে কেবল ধনী ও প্রভুত পরাক্রমশালী রাজা ও সম্রাটবংশাবলী ব্যক্তিবর্গের গৌরব ও মহিমা সন্নি-

বেশিত হয়। ইহাতে নীতি ও উপদেশ শিক্ষা দিবার উদ্দেশে আমাদিগকে ধন সম্ভোগ, দরিদ্র দুঃখ বিমোচন, বিপদোত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। জীবনচরিত অন্যপ্রকার। ইহা কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, সকলের পক্ষেই সমান। এবং সময়ে সময়ে তাহাদের সাংসারিক গতি, রীতি, নীতি, অনুসরণ করিয়া সংসার সাগরে অতি প্রতিপত্তির সহিত আমরা ভ্রমণ করিতে পারি। বাস্তবিক প্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ ডাক্তার জনসন যে লিখিয়াছেন "অহরহ পৃথিবী হইতে যত লোক অজ্ঞাত ভাবে পলায়ন করিতেছে তাহাদের মধ্যে কদাচিত এমন লোক আছে যাহাদের জীবনচরিত পাঠে আমরা যৎকিঞ্চিৎও নীতি শিক্ষা করিতে না পারি।" জাতি ও বংশে কিছুই আসে যায় না। অতি সামান্য জাতি হইতে ও আমরা সহস্র সহস্র নীতি সংগ্রহ করিতে পারি। ইহার একটী প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থল রাণী রাসমণির জীবনচরিত।

প্রথম অঙ্ক।

১২০০ সালে রাসমণি হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোনা নামক গ্রামে ৺ হরেকৃষ্ণ দাসের ঔরসে ও রামপ্রিয়া দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। রাসমণির পিতা সামান্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাসমণি তাহার বৃদ্ধ বয়সের কন্যা। তাহার অন্যান্য পুত্র সন্তানাদি থাকিলেও

তিনি নিজ কন্যাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। রাসমণির পিতা কৈবর্ত্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালিক সামান্য কৈবর্ত্তের ন্যায় নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। তিনি বাল্যকালে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া ছিলেন বলিয়া শেষাবস্থায় কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে পারিতেন এবং এমন কি বাজার হিসাব ও একটু২ জানিতেন। পল্লীগ্রামে সামান্য লেখা পড়া জানিলেই যথেষ্ঠ হইত। তাহাতে আবার হরেকৃষ্ণ গৃহ নির্ম্মাণাদির কার্য্য বেশ সুন্দর রূপে জানিতেন। এতদুভয় কারণে রাসমণির পিতা হালীসহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যখন একটু অবসর পাইতেন অমনি রামায়ণ কিম্বা মহাভারত লইয়া পড়িতেন। রাসমণির পিতা রামায়ণাদি বেশ সুর করিয়া পড়িতে পারিতেন বলিয়া পাড়াস্থ সমস্ত স্ত্রীপুরুষ রাসমণির পিতার বাটীতে আসিত। রাসমণি পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া সকলে তাহাকে আদর করিত ও যখন তাহার পিতা রামায়ণ পাঠ করিতেন তখন পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীরা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বসিত। রাসমণি একদৃষ্টে পিতার ভাব ভঙ্গি দেখিতেন। এইরূপে রাসমণি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে মাতার সহিত একটু২ গৃহ কার্য্য করিতে লাগিলেন। পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে তিনি প্রত্যহ মৎস্য ও তরকারি ক্রয় করিয়া আনিবেন, সে জন্য রাসমণি তাহার মাতার সহিত মধ্যে মধ্যে শাক তুলিতে ও ডুমুর পাড়িতে যাইতেন।

এই অবসরে পাঠকবর্গকে একটী কথা বলিয়া রাখি, বাহুল্য দোষে ক্ষমা করিবেন। একদা রাসমণি অপর এক জন সহচারিণীর সহিত মাতৃ-আদেশক্রমে ডুমুর পাড়িতে গিয়া ডুমুরের ফুল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে রাস-মণির মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল, যে হেতু তাহার একটী ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে ডুমুরের ফুল দেখিলে লোকে রাজা হইতে পারে। রাসমণি ফুল দেখিয়া আপন সহকারীকে দেখাইল, সহচারী দেখিতে পাইল না। তখন দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহা দেখা-ইতে যাইবে এমন সময়ে আর তাহা দৃষ্টিগোচর হইল না। রাসমণির মাতা ও তদীয়া সহচরী ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল "তুই রাজরাণী হইবি বলিয়া ডুমুরের ফুল দেখিয়াছিস।" রাসমণি প্রথমে নিস্তব্ধ থাকিয়া একটু হাস্য করিয়া উত্তর করি-লেন "তোমরা কেমন করিয়া জানিলে রাজরাণী হইব না।" রাসমণি যথার্থই ডুমুরের ফুল দেখিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। এবং ডুমুরের ফুল আছে কিনা, জানি না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে এ সমস্ত কথা তিনি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বলিতেন। তাহার কথার যথার্থতার উপর নির্ভর করিয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিলাম।

রাসমণি শৈশবাবস্থায় যাহা দেখিতেন তাহাই প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুকরণ করিতেন। তাহার পিতা মাতা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ছিলেন। এবং যখনই তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতানুসারে ঝুলী লইয়া অর্চ্চনাদি করিতেন ও গোপী মৃত্তিকার

তিলক পরিতেন, রাসমণি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন এবং আয়না সম্মুখে রাখিয়া তিলক পরিতেন। শৈশবাবস্থায় রাসমণি এই সমস্ত বড় ভাল বাসিতেন। এবং ভবিষ্যতে যে তিনি ধর্ম্মে এত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এই তাহার অঙ্কুর। জীবনী শক্তি ছিল বলিয়া এই সামান্য অঙ্কুর হইতে এমন বিশাল ধর্ম্মবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট ফল বিতরণ করিয়াছে।

ক্রমে রাসমণি তাহার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রমণ করিলেন। এমন সময়ে তাহার মাতা এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাসমণির একটী বিধবা পিতৃস্বসা ও একটী পিতৃব্যপত্নী ছিলেন। তাহারা রাসমণিকে অনেক প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া "তোমার মা" কাল আসিবে বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল। বালস্বভাব স্বভাবতঃ চঞ্চল এক বিষয়ে অনেক ক্ষণ মন থাকে না। ক্রমে রাসমণির ক্রন্দন থামিল। কত "কাল" আসিল কত "কাল" গেল, মা আর ফিরিলেন না। রাসমণি ক্রমে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। এখন রাসমণি ও আর কাহার কাছে থাকেন না, কাহার কাছে যান না। পিতার সহিত আহার করেন, পিতার সহিত বিহার করেন, পিতার সহিত শয়ন করেন। অপত্য-স্নেহ বশতঃই হউক অথবা মাতৃহীনা বলিয়াই হউক হরেকৃষ্ণ রাসমণিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্নেহ করিতে লাগিলেন। রাসমণি ও পিতা ভিন্ন কিছু জানিতেন না, বুঝিতেন না। পিতা

যখন যেখানে কার্য্য করিতে যাইতেন রাসমণিও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। এইরূপে রাসমণি অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তখন হরেকৃষ্ণ ভাবিলেন কন্যার বিহাহের সময় আগত। তাঁহার এমন কিছু সঙ্গতি নাই যে দেশ বিদেশে ঘটক পাঠাইয়া বর অন্বেষণ করিবেন, সুতরাং আপন ক্ষমতা অনুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কন্যার বয়ঃক্রম ১০।১১ হইল। হরেকৃষ্ণ ভাবিয়া অস্থির। এমন সময়ে কলিকাতাস্থ কয়েকটী ভদ্রলোক, কন্যা অন্বেষণে আসিয়া, তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইয়া রাসমণির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

আমাদের বঙ্গকুলকামিনীদের জীবন-নাটকের প্রথমাংশে আখ্যায়িকার উপযুক্ত কিছুই থাকে না। ইহারা শৈশব হইতে দশ বৎসর যাবৎ পিত্রালয়ে থাকিয়া বিবাহানন্তর শ্বশুরালয়ে গমন করে, সুতরাং শ্বশুরালয়ই তাহাদের সমস্ত। সেই তাহাদের রঙ্গভূমি, সেই তাহাদের ক্রীড়াস্থল। শ্বশুরবাড়ীর সামান্য গৃহই তাহাদের অভিনয় স্থান। তাহাদের আর কোথায় যাইবার যো নাই, বসিবার যো নাই, এমন কি অন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবারও যো নাই। শ্বশুরবাটীর যে যেরূপ হউক না কেন, বঙ্গ কামিনীদের সকল সহ্য করিতেই হইবে। বাস্তবিক বঙ্গকামিনীদের শ্বশুরালয়ই জীবন-নাটকের রঙ্গভূমি। তাহারা যাহা কিছু করে সে কেবল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া, অন্যত্র প্রায়ই হয় না —সম্ভবেও না। সুতরাং বঙ্গকামিনীদের শ্বশুরালয়ে

পরিচয় দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। রাসমণির জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্ক প্রায় শেষ হইল, এই সময়ে তাঁহার ভাবি শ্বশুরালয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

রাসমণির শ্বশুরের নাম প্রীতরাম মাড়। ইনি কলিকাতা জানবাজারস্থ জমিদারদের আদি পুরুষ। প্রীতরামের পিতা মাতা শৈশব অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করায়, প্রীতরাম ও তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদর রামতনু ও কালীপ্রসাদ, ১১৭৪ সালে (১৭৮০খৃঃ) নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, জানবাজারস্থ তাৎকালিক বিখ্যাত জমীদার মান্নাদের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই মান্নাদের বাটীতে প্রীতরামের এক পিসির বিবাহ হয়। তিনিই এই পিতৃমাতৃ হীন বালক কয়েকটীকে আপনার নিকটে রাখেন। এসময়ে প্রীতরামের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অপোগণ্ড বালক মাত্র। একে পিতৃমাতৃহীন, তাহাতে আবার বিদেশ, পরের বাড়ী; প্রীতরামের সাতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অগত্যা আপন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হইয়া, উক্ত মান্নাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যৎকিঞ্চিৎ যে বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই একরূপ কাজ চলিত। তাহাতে আবার কলিকাতা আসা অবধি, তাৎকালিক একটু একটু ইংরাজী শিখিলেন। গোরাদের সহিত ইংরাজি বলিতে আরম্ভ করিয়া, স্বল্প দিনের মধ্যে তাহাদের নিকট পরিচিত হইলেন। প্রীতরাম

বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেক গুলি গোরার সহিত আলাপ হইল দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া, একটু২ দালালী কার্য্য করিতে, ও গড়ের সেনাদের রেসান যোগাইতে, লাগিলেন। দালালী কার্য্যে বেশ সুবিধা দেখিয়া, কায়মনোবাক্যে সেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বেশ পসার হইল। এই সময়ে এক জন সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ঢাকায় কর্ম্ম করিতে যান। তিনি প্রীতরামের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আপনার সহিত তাহাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শুভক্ষণে প্রীতরাম তাহাতে সম্মত হইলেন। সাহেব তাঁহার উপর সাতিশয় সদয় হইয়া সঙ্গে লইলেন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয়ে বিশেষ প্রতিশ্রুত হইলেন। তথায় কিছু দিন কর্ম্ম করিলে, সেই সাহেবের অনুগ্রহে তাৎকালিক নাটরের রাজা রামকান্ত রায়ের* সহিত তাঁহার আলাপ হয়। নাটরের রাজাও প্রীত-রামের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে আপন রাজ্যের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। সে সময়ে এই সমস্ত পদে ভারি আয় ছিল। প্রীতরাম কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতা আসিলেন। হাতে টাকা হইলে সকলেই আদর করে। তখন সকলেই মান্য করে, ভক্তি করে। প্রীতরাম কলি-কাতায় আসিলে, সকলই আদর করিতে লাগিল। মান্নাদের বাটীতে যুগল মান্না নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রীত-রামের স্বভাব, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আপন একাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।

---

* রাণী ভবানীর স্বামী।

এই সময়ে প্রীতরামের বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ মাত্র। শুভ দিনে শুভক্ষণে তিনি বিবাহ করিলেন ও যৌতুক স্বরূপ জান-বাজারে কয়েক খানা বাটী ও ১৬ বিঘা জমি পাইলেন। বিবাহ করিয়া বর্ষদ্বয় মাত্র শ্বশুর বাটীতে ছিলেন। পরে তাহাদের সহিত বিবাদ করতঃ পৃথক বাটীতে বাস করিতে মনন করিয়া তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া যৌতুক-দত্ত জমিতে এক খানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রীত-রামের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। প্রীতরাম মহোল্লাসের সহিত যথাসময়ে নামকরণোপলক্ষে, পুত্রের নাম হরচন্দ্র রাখিলেন। ইহার কিছু দিনের পর কলিকাতায় "বরণ" নামে এক জন সাহেব সওদাগর একটী হৌস খুলিলেন। প্রীতরাম ঐ হাউসের মুৎসুদ্দি হইলেন। এই পদেও তাঁহার বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতবাং স্বল্প দিনের মধ্যে তিনি অতুল অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিনি যে সালে মুৎসুদ্দির পদে নিযুক্ত হন, সেই সালেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রীতরাম শুভ দিন দেখিয়া পুত্রের নাম রাজচন্দ্র রাখিলেন। (১১৯৪)।

প্রীতরাম অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন, এক দিন যাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনি কথনই তাহার গুণ ভুলিতে পারিতেন না। তিনি যৎকালে নাটরের রাজ-সরকারে কাজ করিতেন, তখন অনেকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বন্ধুত্বের ফল এখন অল্পে অল্পে ফলিতে লাগিল। প্রীতরাম নাটর হইতে প্রত্যাগমন করিলে

তৎপদে যে দেওয়ান অধিষ্ঠিত হন, তিনি প্রীতরামের পরম বন্ধু। ১২০৭ সালে নাটর রাজার অধিকারস্থ কয়েকটী পরগণা লাটে উঠে; তন্মধ্যে সাতোর ও মকীমপুর নামে দুইটী পরগণা তাৎকালিক দেওয়ান, প্রীতরামের নামে বেনামী করিয়া রাখেন। পরে সেই দেওয়ান, নিজে সাতোর পরগণা লইয়া, জলগড় অনুর্ব্বরা মকিমপুর পরগণা ১৯৫০০ টাকায়, প্রীতরামের নিকট বিক্রয় করেন। এই ক্রয় করিবার পূর্ব্বে প্রীতরামের ঐ পরগণায় যৎকিঞ্চিৎ জমাই জমি ছিল, সুতরাং সে পরগণা লওয়াতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। সুচারু রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া তিনি আপন ভ্রাতা কালীপ্রসাদকে সেই স্থানে নায়েব করিয়া পাঠান। এবং অচিরাৎ তাহা হইতে বিশেষ ফললাভ করিয়া এই সময়ে কলিকাতার সন্নিহিত বেলেঘাটায় দুইটী আড়ত স্থাপিত করিলেন। একটি লবণের ও অন্যটি বাঁশের।*

---

* যশোহরের সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে ওয়েষ্টলণ্ড লিখিয়াছেন :—

"Of the family who at present possess Mokimpur, the first member was Pritram who with his brother Ramdhan, aquired wealth by trade and brought the Zamindari when it was sold up or sortly after it was sold up as part of the Natore estate."

ওয়েষ্টলণ্ড সাহেব মহোদয় রামতনুর পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে "রামধোন" লিখিয়াছেন।

"With his share of the proceeds Sibram purcharsed one or two pergunnahs of the Natore Raj, then being sold. Nasibshahi, Mohimshahi, and Mokimpore. The latter was a Zemindari. The in undations at that time happened to be exceedingly great,

মকীমপুর পরগণা হইতে বাঁশ, কাষ্ঠ, প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আসিতে লাগিল বলিয়া, বাঁশের আড়তে তাঁহার অধিকতর লাভ হইতে লাগিল। তথা হইতে রাশি রাশি বাঁশ জলে ভাসাইয়া আনয়ন করা হইত। সচরাচর লোকে, সেই রাশীকৃত বাঁশকে, "মাড়" বলিয়া থাকে, সেই জন্যেই প্রীতরাম দাসের নাম "প্রীতরাম মাড়" হইল। এবং তাহা হইতে তিনি ও তাঁহার বংশাবলী "মাড়" নামে খ্যাত। যদিও এখন "মাড়" উপাধি বলিয়া প্রীতত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা কোনও উপাধি না। ইহা তিনি আপন ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত হন।

---

as indeed we have found that they were and in the whole pergunnah there was only one holding or Jote which could pay its way, and that was Pritram's holding of Rs. 1000. Sibram Sanyal, therefore, seeing no hope of meeting the Government revenue of Rs. 19000 sold the pergunnah to Pritram for Rs. 19000 which was to be paid in annual instalments of Rs. 1000 each."

ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব কোথা হইতে ইহা পাইলেন জানি না ; আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমার ও দপ্তর খানার কাগজ পত্র দেখিয়া এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি। সাহেব মহোদয়ের লিখিত বিষয় যথার্থ কি না জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না।

"Pritram had a great trade with Calcutta he used to export thither large quantities of reeds, bamboos, wood, fish, the produce of the marshy region about him, and from the proceeds of this trade he met for a year or two the Governmet demands.

Just at that time the great river opened out, the inundations decreased, and immense quantities of silt brought by the river began to raise the land. The pergunnah became more or more fertile, and the estate became a valuable one."

১২০৮ সালে প্রীতরাম, অতি জাঁকজমকের সহিত চাণক নামক স্থানে, স্বীয় পুত্র রাজচন্দ্র দাসের প্রথম বিবাহ দেন। ঐ সালে রাজচন্দ্রের প্রথম স্ত্রী মানবলীলা সম্বরণ করায়, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন।

কিছু দিন পরে, শেষোক্ত স্ত্রীও মানবলীলা পরিহার করায় রাজচন্দ্র, আর বিবাহ করিবেন না, এই রূপ মনস্থ করিলেন। এই সময়ে প্রীতরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র দাস একমাত্র স্ত্রী রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হয়েন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোকে প্রীতরাম পাগলের ন্যায় হইলেন। তিনি দেখিলেন বংশ লোপ হইবার উপক্রম। তখন তিনি, রাজচন্দ্রের কথার অপেক্ষা না করিয়া, দেশ বিদেশে ঘটক পাঠাইলেন। এ সময়ে রাজচন্দ্রের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। ঘটকেরা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, কোথাও উপযুক্তা বয়ঃস্থা কন্যা পাইলেন না। অর্থ হইলে কি না পাওয়া যায়? প্রীতরাম, তাঁহার আপন বন্ধুদিগের মধ্যে অনেককে কন্যা অন্বেষণার্থ, প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা বোটে আরোহণ করিয়া ভাগীরথী তীরবর্ত্তী প্রদেশে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন হালিসহরে উপস্থিত হয়েন, তখন রাসমণি ঘাটে জল আনিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তখন একখানা সামান্য জীর্ণবস্ত্র পরিধান ছিল। বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। দেখিতে অতি সুশ্রী। গৌরবর্ণ, মধ্যমাকৃতি। তাঁহার মুখকান্তি দেখিলেই, স্বর্গীয়া বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার আকৃতি ও পদ সঞ্চালনের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বোটস্থ ভদ্রলোকেরা তৎপ্রতি

এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, এই-রূপ বয়ঃস্থা একটী কন্যা পাইলে ভাল হয়। দুই প্রহর বেলা হইয়াছে, রন্ধনাদি করিবার নিমিত্ত তাহারা ঐ ঘাটে বোট লাগাইল। রাসমণি বালিকা মাত্র। তিনি বোট দেখিয়া সেইদিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে বোট ঘাটে লাগিল। রাসমণি জল লইয়া প্রস্থান করিবেন, এমন সময়ে বোট হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গা বাছা এখানে পাকশাক করিয়া খাবার স্থান কোথায়ও পাওয়া যায়?" ঘাটে আর কেহ না থাকায়, রাসমণি উত্তর করিলেন, উপরে অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী আছে, আপানারা যেখানে যাইবেন সর্ব্বত্রই স্থান পাইবেন।

রাসমণি এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একটি লোক ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। বোটস্থ লোকেরা তাঁহার নিকট উপযুক্ত স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, ঐ কন্যাটীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আগন্তুক বলিল, উনি হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কন্যাটীর কি বিবাহ হইয়াছে? আগন্তুক বলিল "না"—উহার পিতা উহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তখন তাহারা রাসমণির বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া, হরেকৃষ্ণ দাসের বাটীতে আসিলেন। বাটীতে কয়েকটি ভদ্রের আগমন দেখিয়া, হরেকৃষ্ণ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, সাদরে আহ্বান করিয়া, বসিবার আসন দিলেন। তাহারা উপবেশন করিয়া, অতিথি রূপে পরিচয় দিয়া, রাসমণির বিবাহের কথা

উত্থাপন করিলেন। এবং সেই দিনই আহারান্তে এক মোহর দিয়া রাসমণির মুখ দেখিয়া বিবাহের কথা স্থির করিলেন।

দিন নির্দ্ধারিত করিয়া ভাল দিন দেখিয়া রাসমণিকে বাটীতে আনয়ন করা হইল। প্রায় সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে, তিন চারিটি বিবাহ করিতে হইলে, দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রায় সকলেই একটি ফুল গাছ বিবাহ করিয়া থাকেন। রাজচন্দ্রও তাহাই করিলেন। প্রথমতঃ একটি ফুল গাছ বিবাহ করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে রাসমণির পাণিগ্রহণ করিলেন।

একাদিক্রমে প্রথম দুই স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে রাজচন্দ্র তৃতীয়-বার বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই সত্য বটে, কিন্তু সে তাঁহার মৌখিক। তাহারা শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি প্রকৃত পরিণয়-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাসমণিকে পাইয়া রাজচন্দ্র ক্রমেই সুখী হইতে লাগিলেন। রাসমণি যখন দেখিলেন তাঁহার স্বামী পূর্ব্বতন স্ত্রীশোক বিস্মৃত হইয়াছেন, এখন আর তাঁহার সে চিন্তা নাই, সে দুঃখ নাই, তখন তিনি অতি সাবধানে মৃতা স্ত্রীদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং সুবিধা দেখিলে, যাহাতে স্বামীর মনঃকষ্ট না হয় এই রূপে একটু একটু তামাসা করিতেন। এইরূপে বর্ষত্রয় গত হইলে, ১২১৩ সালে রাসমণির প্রথম কন্যা ভূমিষ্ঠ হন। পৌত্রীর মুখাবলোকন করিয়া প্রীতরাম সাতিশয় প্রীত হইলেন ও যথাসময়ে তাহার নাম পদ্মমণি রাখিলেন।

বাটিতে আর কোন বৌ ঝি না থাকাতে সকলই রাস-

মণিকে আদর করিত ও ভাল বাসিত; কিন্তু রাজচন্দ্র পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের বর্ত্তমানে লজ্জাবশতঃ প্রকাশ্যে কোনও রূপ ভালবাসা দেখাইতে পারিতেন না। তিনি রাসমণিকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। দিনমানে যদিও প্রায়ই পরস্পর দেখা হইত না, তথাপি তিনি যে কোনও প্রকারে হউক রাসমণির তত্ত্বাবধান করিতেন। রাসমণিও স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তি দেখাইতেন। তিনি বয়সে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, কিন্তু বুদ্ধিতে রাজচন্দ্র অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না। পিতৃভবনে রাসমণি কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই; লেখা কি পদার্থ কিছুই জানেন নাই সত্য বটে, কিন্তু এখন সুবিধা পাইয়া স্বামীর নিকটে একটু একটু লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বড়মানুষের বাটির স্ত্রী-কন্যাদিরা দাসদাসীতে পরিবেষ্টিতা থাকায় তাহাদের সংসারের কিছুই করিতে হয় না, দেখিতেও হয় না। রাসমণি যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহাই সম্পাদিত হইত বলিয়া, লেখা পড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন। তাঁহার শাশুড়ী যদিও লেখাপড়ার বিদ্বেষিণী ছিলেন, তথাপি রাসমণিকে কিছুই বলিতে পারিতেন না। রাজচন্দ্রের একান্ত যত্ন ও তাঁহার নিজের একান্ত অধ্যবসায়ের গুণে, রাসমণি যৎকিঞ্চিৎ পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলা পাঠাভ্যাসে বড় বিঘ্ন হইত বটে কিন্তু, রাত্রে সেই ক্ষতি পরিপূরিত হইত। তিনি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমার্জ্জিতা ও পরিশোধিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে

ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। তিনি এখন অট্টালিকায় বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু, তাঁহার সে পিতৃকুটীর বিস্মৃত হন নাই। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া তথায় আপন ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন দিগকে আনিয়া রাখিলেন। পিতৃদেবকে মাসে মাসে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাসমনির পিতা রাসমণির শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া, তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি কলিকাতা আসিয়া তাঁহাদের সহিত বাস করিবেন। রাসমনি, তাঁহার পিতাকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি এখানে থাকিতে অভিলাষ করিবেন না। জন্মভূমি ত্যাগ করিবেন না। বিশেষতঃ বৈবাহিক বাড়ীতে থাকিতে নাই। ইহাতে অনেক প্রকারে মানের হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব এ অভিলাষ ত্যাগ করুন। আপনার যাহা কিছু লাগিবেক, সমস্ত খরচ আমি পাঠাইয়া দিব। বাটিতে গিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হউন, কিছুই ভাবিবেন না। রাসমণির পিতা কন্যার ঈদৃশ কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাসমনি পিতাকে এতাদৃশ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া সাতিশয় অপ্রতিভ হইলেন; যে হেতু আপনার হস্তে এমন কিছু নাই যে পিতার সমগ্র ব্যয়ের আনুকূল্য করিতে পারিবেন। তখন অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বীয় পতির নিকট সুবিধামতে সমস্ত জ্ঞাত করাইলেন। রাজচন্দ্র অতীব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পত্নীর ঈদৃশী পিতৃভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া দুজনে পরামর্শ করিলেন। রাজচন্দ্র এখন স্বাধীন নহেন। তিনি

ইচ্ছা করিলে যদিও দিতে পারিতেন, তথাপি পিতা কি মনে করিবেন এই ভয়ে সাহসী হইলেন না। সচরাচর সন্তানেরা পিতার নিকট যে বিষয় বলিতে লজ্জা বোধ করে, ভয় করে, মাতার নিকট তাহা অনায়াসে বলিতে পারে। রাজচন্দ্র মাতার নিকট সমস্ত বলিলে, তাহার মাতা স্বীয় স্বামী প্রীতরামের নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রীতরাম পুত্রবধূর পিতৃভক্তি ও ধর্ম্মভক্তি দেখিয়া বলিলেন, "আমার বৌ মার মত মেয়ে কোথাও দেখি নাই। বেঁচে থাকেন ত ইহাঁর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা আর দুটি হইবে না।" কিছু দিনের মধ্যে প্রীতরাম বৈবাহিকের বেশ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে রাসমণির দ্বিতীয় কন্যা ভূমিষ্ঠা হন। প্রীতরাম তাঁহার নাম কুমারী রাখিলেন। এই সময়ে তিনি যে বাটিতে বাস করিতেন, তাহা সমধিক সঙ্কীর্ণ হওয়ায় নূতন বাটি প্রস্তুত করিতে মনন করিয়া ১২২০ সালে অধুনাতন বর্ত্তমান বাটির প্রথম সূত্রপাত করেন। ইহার কিছু দিন পরে রামতনু নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১২২৩ সালে কালীপ্রসাদ, দুই পুত্র অভয়চরণ ও উমাচরণকে রাখিয়া মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হন। পরে ১২২৫ সালে প্রীতরাম মহাড়ম্বরে সিতি নিবাসী রামচন্দ্র দাসের সহিত স্বীয় দৌহিত্রী পদ্মমণির বিবাহ দেন। ১২২৪ সালে রাসমণির তৃতীয় কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেন। শুভ দিনে তাঁহার নাম করুণাময়ী রাখিলেন। পরে ১২২৪ সালে প্রীতরাম আপন পত্নী ও এক মাত্র পুত্র রাজচন্দ্র, পুত্রবধূ রাসমণি ও তিনটি দৌহিত্রী ও একটি দৌহিত্রী জামাতা

রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ৬।।০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান। রাজচন্দ্রের অন্য কোনও ভ্রাতা না থাকায় তিনিই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। নূতন বাটির সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতরাম ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় অন্যান্য লোকে রাজচন্দ্রকে সেই নূতন বাটি প্রস্তুত করিতে নিবারণ করেন। রাজচন্দ্র রাসমণিকে এ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনি বলিলেন, যাহাদের আয়ুঃ শেষ হইবে তাহারাই মরিবে। বাটি প্রস্তুত করিলেও তাহারা মরিত, না করিলেও তাহারা মরিত, অতএব আপনি কাহারও কথা শুনিয়া ভয় করিবেন না; কোনও ভয় নাই। রাসমণির কথা শুনিয়া রাজচন্দ্রের সমস্ত ভয় দূরীভূত হইল। রাজচন্দ্রের হস্তে সমস্ত সংসারের ভার অর্পিত হইল বটে, কিন্তু তিনি যে কার্য্য করিতেন স্বীয় পত্নীর পরামর্শ না লইয়া করিতেন না। রাজচন্দ্র সমস্ত বিষয়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত ভাল ভাল কর্ম্মচারী রাখিয়া যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইবে তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হঠাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে লোকে প্রায়ই ভোগ-বিলাসী হয়। রাজচন্দ্রের তাহার কিছুই হয় নাই। পিতার মৃত্যু অবধি তিনি কলিকাতার প্রধান প্রধান দেশীয় কিংবা বিদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় তৎকালে এমন প্রধান ইংরাজ কিংবা বাঙ্গালী ছিল না যাহাদের সহিত রাজচন্দ্রের আলাপ কিংবা পরিচয় হয় নাই।

তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া তাৎকালিক প্রধান প্রধান সাহেব ও ব্যবসায়ী দিগের আফিসে এবং এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাটিতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও সময়ে অর্থের প্রয়োজন হইত, রাজচন্দ্র তাঁহাদের অবস্থা ও সময় বুঝিয়া সাহায্য করিতেন ও কর্জ্জ দিতেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি নূতন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এক্‌স্‌চেঞ্জ ও অন্যান্য সওদাগরদের হৌসে যাইতেন ও সুবিধা মত দ্রব্যাদি পাইলে প্রায় ক্রয় করিয়া আনিতেন; এইরূপে তামার চাদর, কস্তুরা, আফিম, নীল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী করিতেন। বিলাতে কল্‌বিন্‌ কাউই এণ্ড কো নামক তাঁহার এজেন্ট ছিল।

রাজচন্দ্র এই সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, রাজচন্দ্র প্রত্যহ স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক এক্‌স্‌চেঞ্জ ও অন্যান্য আফিসে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন এইরূপে পর্য্যটন করিতে করিতে এক্‌স্‌চেঞ্জ আফিসে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, অতি সত্বরই আফিমের নীলাম হইবে। অন্যান্য বণিকেরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ঘোরতর প্রবল ঝটিকা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিল। সুতরাং পথিকদের গতিরোধ হইল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান বণিকেরা কেহই যথাসময়ে এক্‌স্‌চেঞ্জের হাউসে উপস্থিত হইতে পারে নাই। নীলাম আরম্ভ হইল, রাজচন্দ্র সুবিধা

বুঝিয়া সমস্ত অহিফেন পঁচিশ হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। ক্ষণকাল পরে বৃষ্টি ও ঝটিকা থামিলে, অনেক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাড়য়ারী মহাজনেরা তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিল, একটী বাবু সমস্ত অহিফেন ক্রয় করিয়াছেন; তখন তাহারা সকলে রাজচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া সেই সমস্ত অহিফেণের প্রার্থী হইল। রাজচন্দ্র সেই অহিফেন পুনরায় নীলামে উঠাইলেন। ক্রমে দর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে ২৫ হাজার টাকার দ্রব্যে ৭৫ হাজার টাকা হইল। রাজচন্দ্র ২৫ হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া ৫০ হাজার টাকা লইয়া বাটি প্রত্যাগমন করিলেন। রাজচন্দ্রের ভাগ্যদেবী এইরূপই ছিল, যে, তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত।

১২২৬ সালে রাসমণি এক মৃত পুত্র প্রসব করেন। ১২৩০ সালে তাহার চতুর্থী কন্যা ভূমিষ্ঠা হন। রাজচন্দ্র, নামকরণোপলক্ষে তাঁহার জগদম্বা নাম রাখিলেন।

এই সময়ে রাসমণির পিতা এক মহৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাসমণি, সাতিশয় শোকান্বিতা হইয়া, তৃতীয় দিবসে মহা মহোৎসবের সহিত আদ্যকৃত্য সমাপন করিলেন। রাজচন্দ্রের স্নেহ ও ভাল বাসায় রাসমণি ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক বিস্মৃতা হইলেন।

অশৌচান্তের দিবস রাসমণি গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, ঘাটে নামিবার বড় কষ্ট। ভাল ঘাট নাই, সুতরাং স্নান করিবার বড় অসুবিধা। কি করিবেন, সে দিন কোনও

রূপে কার্য্য সমাধা করিয়া কথায় কথায় একদিন রাসমণি স্বীয় পতিকে বলিলেন, আমাদের বাটীর নিকটে এমন কোনও সুবিধা মত ঘাট নাই, যে স্থানে সকলে স্নান করিতে পারে, অতএব নিকটে একটী ঘাট করিলে ভাল হয়। রাসমণির কথা শুনিয়া, রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বাটীর সন্নিকটে একটী ঘাট প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং ১২৩৮ সালে চাঁদপাল ঘাটের সন্নিকট বাবুঘাট প্রস্তুত করিলেন। এবং মনুষ্যাদির গমনের সুবিধার্থে জানবাজার ষ্ট্রিটের সংশ্লিষ্ট গড়ের মাঠের মধ্যপ্রদেশ দিয়া "বাবুরোড" নামক একটি সুবিস্তীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। *

রাজচন্দ্রের পিতা বেলেঘাটায় দুইটী আড়ত রাখিয়া যান। সে সময়ে বেলেঘাটায় খাল ছিলনা; পরে রাজ-চন্দ্র যখন উহার অধিকারী হন, তখন তথাকার অন্যান্য মহাজনদের সহিত একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্মে আবে-দন করেন, যে, বাণিজ্য দ্রব্যাদির আনয়নের সম্যকরূপে সুবিধা না থাকাতে তাহাদের বড় কষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট

* এই রাস্তা প্রস্তুত করিতে রাজচন্দ্র বিস্তর কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ময়দানের মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমতঃ কালেক্টরিতে আবেদন করেন। তাহারা এ বিষয়ে অস্বীকার করায় দুর্গা-ন্তর্গত গেরিসন মাষ্টারকে জ্ঞাত করেন। তিনি কোনও উত্তর না দেওয়ায় গবর্ণর বাহাদুরের নিকট স্বয়ং গিয়া প্রকাশ করেন। গবর্ণর বাহাদুর অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া আদেশ দিলেন। রাজচন্দ্র এ সমস্ত বিষয় আপন হস্তে রাখিবার জন্য সেই স্থান বিস্তর অর্থ দিয়া ক্রয় করিলেন।

এই আবেদন মতে একটী খাল্ খনন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ঐ বিষয়ে যত জন উদ্‌যোগী ছিলেন, রাজচন্দ্রই তাঁহাদের অগ্রগণ্য। ঐ খাল খনন করিতে তিনি এক সহস্র মুদ্রা দান করেন এবং আপন অধীনস্থ যে ভূমি, খালের মধ্যে পড়িয়াছিল, সমস্তই বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দেন। রাজচন্দ্র এই মহদ্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া, রাসমণিকে জানাইলেন, রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের আড়তের কত দূরে খাল হইবে।" রাজচন্দ্র বলিলেন, "অতি সন্নিকট।" তখন রাসমণি একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আপনি যখন এতই দান করিলেন, তখন সাধারণ লোক জনের ঐ খাল পার হইবার কোন একটি সুবিধা করিয়া দিলে বোধ হয় ভাল হয়।" রাসমণির কথায় রাজচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যাতায়াতের জন্য একখানা খেয়া নৌকা হইবে।" রাসমণি পুনশ্চ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "খেয়া নৌকা হইবে তাহা বুঝিতেছি কিন্তু, সেই নৌকা আমাদের অধীনে রাখিতে পারিলে ভাল হয়।" তিনি যাহা বলিলেন রাজচন্দ্র তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া এইরূপে গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, তাঁহার বাটি হইতে অথবা তাঁহার নাম করিয়া যে আসিবে, তাহাকে বিনা মূল্যে পার করা হইবে।

রাসমনির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহার পতির অন্তরে এখন সম্যক-রূপ প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি এক দিবস আপন চ্যারিয়টে চড়িয়া গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, কয়েকটি ভদ্রলোক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন একটি

স্ত্রীলোককে আনিয়া নিমতলা ঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় তখন এমন কোনও স্থান ছিলনা যে, মুমূর্ষু ব্যক্তিরা সুরক্ষিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত তিনি ১২৩২ সালে নিমতলায় একটি সুরম্য ঘাট ও গৃহ প্রস্তুত করিয়া, আগন্তুকদিগের সুবিধার্থে তথায় একজন দ্বারপাল, একজন চিকিৎসক ও দুই একজন ভৃত্য রাখিয়া দিলেন।

রাসমণি পতির এবম্বিধ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, এক দিবস নিমতলায় গৃহ দেখিতে গিয়া, বাগবাজারস্থ বিখ্যাত মদনমোহন ঠাকুর দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মদনমোহন দেখিয়া আসিবার কালে আহিরীটোলা হইয়া আসিতেছিলেন। এমন সময়ে তথাকার লোকের স্নানাদি করিবার বড় কষ্ট দেখিয়া তিনি বাটী আসিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলেন, "আহিরীটোলার লোকের স্নান করিবার অসুবিধা, অতএব তথায় একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহাদের বড় উপকার হয়; রাজচন্দ্র স্ত্রীর মতানুসারে তথায় একটি ঘাট ও চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে লর্ডবেণ্টিক ভারতবর্ষের গবর্ণরী পদ প্রাপ্ত হইয়া মহোৎসাহের সহিত রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার নাম সমস্ত ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তিনি সহমরণ প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করাতে সমস্ত বঙ্গদেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর দেখিলেন,

তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হইবার অত্যন্ত অসুবিধা। তখন তিনি কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান মনুষ্য ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, মান্যমান্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রায় প্রত্যহই গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইতেন। গবর্ণর জেনেরল মহোদয়ের সহিত রাজচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় থাকাতে তিনিও প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন। যখন সহমরণ প্রথা উঠিয়া যাইবার আইন সংস্থাপিত হইল, তখন একদিন রাত্রে রাজচন্দ্র হাসিতে হাসিতে স্বীয় পত্নী রাসমণিকে বলিলেন, "শুনিয়াছ, সম্প্রতি একটী আইন প্রচলিত হইয়াছে যে, কেহ আর স্বামীর সহিত মরিতে পারিবে না। সে দিন বড় লাট সাহেবের বাটীতে একটী সভা হইয়াছিল, তাহাতে কত লোকে ইহার বিরুদ্ধে বলিল। বাস্তবিক সহমরণ প্রথা নিবারিত হওয়াতে আমাদের দেশের ভারি মঙ্গল হইল।"

রাসমণি স্বীয় পতির এবম্বিধ কথা শুনিয়া সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সহমরণ প্রথায় আমাদের অনেক সুবিধাও ছিল, অসুবিধাও ছিল। আমাদের দেশের কামিনীদের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে তাহা প্রচলিত থাকাই ভাল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের স্বামীই ধর্ম্ম, স্বামীই অর্থ, স্বামীই মোক্ষ, স্বামীই জীবন; অতএব স্বামীর মৃত্যুর পরে আমাদের থাকা না থাকা সমান, আমাদের জীবনই বৃথা। বড় লাট সাহেব সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিলেন ভালই বটে কিন্তু, বঙ্গবিধবাদের পরিত্রাণের অন্যবিধ উপায় রহিল না। তাহারা যে কত কলঙ্ক

রাশিতে কলঙ্কিত হইবে বলা যায় না।” রাসমণি আপন মনোভাব প্রকাশ করাতে রাজচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা আমি যদি এখন মরি তুমি কি করিবে?” রাসমণি পুনরায় বলিলেন “ঈশ্বর যেন তাহা না করেন, আমিই যেন পূর্ব্বে মরি”। রাজচন্দ্র আপনার সম্বন্ধে আরও বলিতেন, কিন্তু তিনি বলিতে দিলেন না। সহমরণ নিবারণ বিষয়ে রাসমণি এবম্বিধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রসম্মত বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন না। কেন না ইহার অনেকদিন পরে যখন পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ লইয়া বঙ্গসমাজে মহাপ্রলয় উপস্থিত করেন। বিধবা রাসমণি, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ও তদ্বিরুদ্ধে যে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেসমস্ত আনয়ন করিয়া, স্বীয় পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পাঠ করান এবং আপনি অত্যন্ত মনঃসংযোগের সহিত সেই সমস্ত বাদানুবাদ শ্রবণ করেন। তিনি এক দিবস আপন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্ত্রে যখন বিধবাবিবাহের বিধি আছে, তখন লোকে তাহা করে না কেন? পুরোহিত সাত পাঁচ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি না বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর রাসমণির প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পুস্তক লিখিতেন, রাসমণি তাহাই আনাইয়া পাঠ করিতেন। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি বিধবা-বিবাহের উপসংহার ও বহুবিবাহ পুস্তকের

অনেকাংশ শ্রবণ করিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

লর্ডবেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সামাজিক বিষয় হইতে যখন প্রজাবর্গের মানসিক উন্নতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তখন তিনি ভাবিলেন,পাশ্চাত্য সাহিত্য ভিন্ন ভারতবাসিদের উন্নতির আর আশা ভরসা নাই। ইংরাজি রীতি নীতি ভিন্ন এ ঘোর অন্ধকার হইতে উদ্ধার হইবার আর কোনও উপায় সম্ভবে না। তখন তিনি কলিকাতা নগরীতে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইংরাজি ভাষা শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে একটি কালেজ সংস্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তৎকালে হিন্দুদিগের এরূপ একটি বিশ্বাস ছিল যে, ম্লেচ্ছ ভাষা অধ্যয়ন করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। সেই জন্য কেহই আপন সন্তান দিগকে কালেজে পাঠাইতেন না। বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর অনেক লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও অভিপ্রেত বিষয়ের ফল লাভে সমধিক বিলম্ব দেখিয়া, দেশীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করায়, তাৎকালিক কৃতবিদ্য প্রধান প্রধান লোকেরা অনেকে এতদ্ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিলেন। রাজচন্দ্র নিজে অনেক অর্থ প্রদান করিলেন ও ১০টি বালকের সমস্ত আনুকূল্যের বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমে বিদ্যালয়টি বদ্ধমূল হইলে, লর্ডবেণ্টিঙ্ক বাহাদুর উহার নাম হিন্দুকলেজ রাখিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে দানশীলা রাসমণি আপন প্রভুত্বের সময়ে ১০।১২ জন ছাত্র আপন বাটিতে রাখিয়া সমস্ত ব্যয়ের আনুকূল্য করিতেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক অতি সম্মানের সহিত ৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, মান্যবর মেটকাফ সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। এই মেটকাফ সাহেবই প্রথমতঃ আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, সাতিশয় উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধুনাতন সাধারণ-পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম "মেটকাফ হল" রাখিলেন। এই মেটকাফ হল সংস্থাপিত করিবার সময়ে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। মেটকাফের সহিত রাজচন্দ্রের বিশেষ সদ্ভাব থাকাতে তথায় তিনিও নিমন্ত্রিত হন। এই পুস্তকাগার সংস্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া ছিলেন। রাজচন্দ্র অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাঁচসহস্র মুদ্রা দান করিয়া এইরূপ একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন, আমি কিংবা আমার উত্তরাধিকারীগণ যে কেহই হউক না কেন, এই পুস্তকাগার হইতে বিনামূল্যে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে পারিবেক। রাজচন্দ্র যাহা ইচ্ছা করিলেন তাহাই সম্পাদিত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কেহই তৎপ্রতি মনোযোগ না করায় সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত সৎকার্য্য ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে রাজচন্দ্র অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। লর্ডবেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শাসন সময়ে, বঙ্গদেশ ১২৪০ সালের মহান্ দুর্ভিক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজচন্দ্র সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদের অনেক

দুঃখ বিমোচন করেন। লর্ডবেণ্টিঙ্ক এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে রাজচন্দ্রের মহৎ গুণ সমূহ, দয়া দাক্ষিণ্য ও উদারস্বভাব দেখিয়া, "রায়' উপাধি দিয়া ধর্ম্মের পুরস্কার প্রদান করিয়া যান। রাজচন্দ্র এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। ১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে; তিন কন্যা ও তিন জামাতা ও ৪।৫ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রাজচন্দ্র বহুবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার অন্তরে ঈষৎ পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ইংরাজি ভাষায় কথঞ্চিৎ পারদর্শী হওয়ায় অনেক প্রধান প্রধান ইউরোপীয়দের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। তিনি বাটীতে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া তাৎকালিক অনেক সংবাদ-পত্র লইতেন। শৈশবে ভাল ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই সত্য বটে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বাটিতে একজন ইংরাজ রাখিয়া রাজকীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। তিনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেন না। কোন সময়ে একজন ইংরাজ মহাজন তাঁহার নিকট ৮০ হাজার টাকার প্রার্থী হন। রাজচন্দ্র, পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে সেই মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু, কয়েকদিন পরেই পরস্পর শুনি-লেন, উক্ত মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। রাজচন্দ্র কি করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে অর্থ দানে অঙ্গীকার করিয়াছেন

বলিয়া, কোনওমতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সাহেব অর্থের জন্য আসিলে, রাজচন্দ্র সানন্দে তাঁহাকে অশীতি সহস্র মুদ্রা দিলেন। সাহেব যথাসময়ে টাকা পাইয়া সাতিশয় উপকৃত হইলেন ও আপন অবস্থা উন্নতি করিয়া রাজচন্দ্রের টাকা পরিশোধ করিলেন।

তাঁহার জীবদ্দশায় তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়াতে, তিনি তৃতীয় জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের বুদ্ধিমত্তা ও সদ্‌গুণ দেখিয়া ১২৩৯ সালে আপন চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত তাহার বিবাহ দেন। রাজচন্দ্রের মৃত্যু হওয়াতে চতুর্দ্দিকে গোলমাল উত্থিত হইল। মৃত্যু সময়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান। এতদ্‌ভিন্ন তিনি অনেক গুলি পরগণা ক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন। এই অতুল সম্পত্তি কি রূপে রক্ষা করা হইবে, এই লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। অনেকে অনেক পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিল। রাসমণি পতির বিয়োগে যার পর নাই হতাশ হইলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশৌচাদি সমাপ্ত হইল। রাসমণি প্রায় ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পতির শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

রাসমণির জীবন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল। তিনি এখন বিধবা। পতির জীবিতাবস্থায় তিনি স্বয়ং কোনও কার্য্য করিতে পারেন নাই সত্য বটে কিন্তু, সর্ব্ববিষয়ে সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। রাসমণি এখন বিধবা কিন্তু প্রবীণা, এখন আর তাঁহার সে বালস্বভাব নাই। পতির অনুগ্রহে তিনি অনেক

শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া,নিজেই সমস্ত রক্ষা করিবেন বলিয়া সাহসিনী হইলেন। পতির মৃত্যুর দেড় মাস পরে আপন জামাতৃত্রয়কে ডাকিয়া বলিলেন, অনেকে ম্যানেজার রাখিতে বলিতেছেন, কিন্তু তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে আমার সে অভিপ্রায় হয় না। তোমরা যদি বাহিরের কাজ কর্ম্ম একটু দেখিতে পার, তাহা হইলে আর ম্যানেজার রাখিবার দরকার নাই। রাসমণির কথায় তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর রাসমণির নিকট প্রকাশ করেন যে, আপনাদের এই বহুল বিষয় রক্ষা হইবার আর উপায় দেখি না। আপনার জামাতারা যে ইহা রক্ষা করিবেন, এরূপ আশা করি না। যদি সমস্ত ভার আমার উপর অর্পণ করেন, আমি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারি। কিছু দিন পরে আপনার জামাতারাই ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। দ্বারকানাথ, রাসমণিকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন। রাজচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়া, তিনি রাসমণির সহিত বিশেষ পরিচিত হন, এবং রাজচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে প্রায় ১॥০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ লয়েন। দ্বারকানাথ, যখন ম্যানেজার হইবার প্রস্তাব করেন, তখন রাসমণি কহিলেন, একজন ম্যানেজার রাখিবার নিতান্ত প্রয়োজন সত্য বটে,কিন্তু কোথায় কি আছে ও কাহার নিকট কি পাইব, তাহা একটা স্থির করিয়া পরে ম্যানেজার রাখিব। প্রায় সমস্তই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখন আর কয়েকটি হইলেই হয়। রাসমণি সুবিধা বুঝিয়া, পুনরায় বলিলেন,

আমার পতি আপনাকে প্রায় ১॥০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, আপনি যদি সে টাকা গুলি এখন দেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

দ্বারকানাথ বিবেচনা করিলেন,এ টাকা না দিলে আমাকে ম্যানেজারী পদ কখনই দিবে না। অতএব এখন যে প্রকারে হউক তাহা দেওয়া যাক; পরে সমস্তই যখন আমার হস্তে পতিত হইবে, তখন আর ভয় কি? দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ সানন্দে সমস্তই দিলেন। রাসমণি সমুদায় হস্তগত করিয়া দ্বারকানাথকে বলিলেন, আমার জামাতৃত্রয় জীবিত থাকায়, আর ম্যানেজার রাখিবার দরকার নাই। দ্বারকানাথ হতাশ হইলেন। এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় রাসমনিকে "টেপীপিসী" ও দ্বারকানাথকে "ঠকচাচা" অভিধান দিয়াছেন।

রাসমণি, অপর কাহাকেও ম্যানেজারী পদ না দিয়া, তাঁহার জামাতৃত্রয়ের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। এখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া ধর্ম্মে মনঃ সংযোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৈশবে মনোমধ্যে যে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন তাহা সুমিষ্ট ফল প্রসব করিতে লাগিল। রাসমনি বিধবা হইয়া প্রথমতঃ অতি মহোৎসবের সহিত রাসোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রতি বৎসর প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

রাসমণি বঙ্গকামিনী, কি প্রকারে যে দেশের সমধিক উন্নতি হয়, বিশেষ বুঝিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে এরূপ

বিদ্যা, দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি ছিল না। তিনি ভাবিতেন, যাগ যজ্ঞাদিতে অর্থ ব্যয় করিলে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল। সেই জন্য পরোপকার, বার্ষিক ও দৈনিক কার্য্যকলাপে, মনো নিবেশ করিতেন।

রাসমণি এখন অন্য আর একটি মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২৪৫ সালে তিনি রথোৎসব করিবেন বলিয়া অভিলাষ করিলেন। সর্ব্বত্রই কাষ্ঠ রথ আছে, রাসমণি ভাবিলেন কাষ্ঠরথে কোনও রূপ সুবিধা নাই। ইহা কিছু দিন পরে ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; এজন্য তিনি নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন জামাতৃত্রয়কে ডাকিয়া এক দিন বলিলেন, আমি সামান্য কাষ্ঠের রথ নির্ম্মাণ করিব না। অন্যান্য লোকে যাহা করে নাই, তাহাই করিব। বাঁচিয়া থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা করিতে পারি, তাহাই ভাল; অতএব একখানা রৌপ্য রথ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগী হও। তাঁহার জামাতৃত্রয় পরামর্শ করিয়া, হেমিল্টন প্রভৃতি কর্ম্মকারের বাটিতে রৌপ্য-পাত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। রাসমণি সে কথা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন বিদেশীয় ম্লেচ্ছদের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের দেশে কি আর স্বর্ণকার নাই? তাহারা কি পারে না? আমাদের দেশীয়দের হস্তে সেই কার্য্য অর্পণ কর। দেশীয়দের দ্বারা ইহা প্রস্তুত করাইলে তাহারা সাতিশয় উপকৃত হইয়া বাধিত থাকিবে।

রাসমনির এই কথা শুনিয়া তাঁহার জামাতারা অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন। এদিকে উদ্যোগ করিতে করিতে সময় নিতান্ত

সংক্ষিপ্ত হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রাসমণি,তথাপি সেই অল্প সময়ের মধ্যে রৌপ্য রথ প্রস্তুত করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া, তৎক্ষণাৎ ভবানীপুর, সিতি, প্রভৃতি স্থান হইতে কর্ম্মকার আনয়ন করিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। রৌপ্য রথ ত্বরায় প্রস্তুত হইলে, রাসমণি মহোৎসবের সহিত ১২৪৫ সালের রথযাত্রার দিবস,রৌপ্য রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া,পূজা করিলেন। সমস্ত নগরে, উপনগরে, রাসমণির রৌপ্যরথের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে লোকে দূর দেশ হইতে, রৌপ্যরথ দেখিতে আসিল। সেই অবধি তিনি প্রতিবৎসর এই রথোপলক্ষে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার দায়াদগণ, এখনও অত্যন্ত মহোৎসবের সহিত, রথযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

রাসমণি স্বয়ং শিবভক্তি-পরায়ণা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃপিতামহদের মান্যার্থে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বড় বড় উৎসব করিতেন। রাসমণি এখন ঝুলনযাত্রা আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি আপন বাটী এমন সুন্দর রূপে সজ্জিত করিতেন যে, কলিকাতাস্থ সমস্ত ইউরোপীয়-মণ্ডলী তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইত।

এই সময়ে রাসমণি একদিন কলিকাতাস্থ সমস্ত বড় বড় ইউরোপীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করেন। গবর্ণর বাহাদুরের কোনও বিশেষ কার্য্য থাকাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ছোট লাট সাহেব উপস্থিত হইয়া মহা ধূমধাম করিয়া কার্য্য-সমাধা করিলেন। এই উপলক্ষে এক রাত্রে তিনি পঞ্চদশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাসমণি ব্যয়-সঙ্কুচিতা ছিলেন না। তিনি কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সমস্ত মতই পালন করিতেন। কিছুই অবহেলা না করিয়া বরং তিনি সমস্ত দেবদেবীরই অর্চ্চনা করিতেন। তিনি বলিতেন, এ সমস্তই যখন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত, তখন কাহাকেও অবহেলা করা উচিত নহে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি সমধিক আড়ম্বর করিতেন। একদা দুর্গোৎসবের কদলীবধূর স্নানোপলক্ষে, বাজনা বাজাইয়া জানবাজার ষ্ট্রীট দিয়া, রাসমণির লোকেরা মহাধুমধাম করিয়া যাইতেছিল; এমন সময়ে জানবাজার ষ্ট্রীটান্তর্গত কোন একটী বাটী হইতে একজন ইংরাজ বাজনা বাজাইতে নিবারণ করে। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাসমণীর নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি আদেশ করিলেন আরও বেশী ধুমধাম করিয়া যাও, কাহাকেও ভয় করিও না। সে দিন এইরূপ অনেক গোলমাল হইলে, সাহেবটী পুলিষে সংবাদ দিলেন, পুলিষ তদ্বিষয়ে মনোযোগ না করায়, রাসমণি পরদিবস ৫০টী ঢাকীকে আসিতে আদেশ করিয়া, বলিলেন, আমার বাটী হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বাজাইতে বাজাইতে যাইতে হইবে। একে ঢাকের বাদ্য, তাহাতে আবার পঞ্চাশৎ! কলিকাতায় হুল স্থূল পড়িয়া গেল যে, রাসমণীর সহিত বড় লাট সাহেবের ঝগড়া হইয়াছে; গত কল্য কলা বৌ স্নানের সময়ে বড় লাট সাহেব ঢাক বাজাইতে নিবারণ করায়, রাসমণি আরও বেশী বাদ্য করিয়া যাইতেছেন। এই কথা প্রচারিত হওয়ায়, রাসমণির নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; রাসমণির যশোভাগ্য এইরূপই ছিল। কোথায়ও কিছুই

নাই, তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এত ঢাকের বাদ্যেতে পুলিষ হইতে নোটিস বাহির হইল যে, বিনা পাসে এরূপ ধুমধাম করিয়া কেহ যাইতে পারিবে না। সেই অবধি কলিকাতায় পাশের সৃষ্টি হইল। রাসমণি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন,আমার রাস্তা দিয়া আমি যাইব,সেজন্য আমার পাসের দরকার কি? রাসমণি এজন্য পুনঃ২ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে লাগিলেন। এসময়ে তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার অনুগতেরা জানবাজার ষ্ট্রীট ও বাবুরোডে কয়েক খানা গরাণ দিয়া যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করিল। রাসমণির নাম আরও বাহির হইল। পথ রুদ্ধ হওয়ায়, পুলিষ আসিল। মাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে রাসমণি পথ মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। পথ মুক্ত হইল। রাসমণির প্রতিজ্ঞাও বজায় রহিল। রাসমণি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রাস্তা কয়েকটী আপন অধীন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করায় গবর্ণমেণ্ট সে সমস্ত নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

রাসমণির নাম ক্রমে কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। সাধারণ লোক সমূহ তাঁহাকে "রাণী রাসমণি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এই সময়ে রিবার পোলিষ হইতে জলকর নামক একটী টাক্স নিরূপিত হইল। সর্ব্বত্রই এই কর প্রচলিত হওয়ায়, গঙ্গায় যাহারা মৎস্য ধরিত, তাহাদের টাক্স দিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী ধীবরেরা মহা ব্যস্ত। গবর্ণমেণ্টে কত আবেদন করিল, কিছু-

তেই ঐ কর হইতে তাহারা মুক্তি লাভ করিল না। কলিকাতার অনেক ধনীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। এই সময়ে রাসমণির নাম ক্রমে উর্দ্ধগামী হইতেছে। ধীবরেরা অনেকে আসিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল। রাসমণি তাহাদের গোলমাল শুনিয়া, বাহিরে বারেন্দার খড়খড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি প্রার্থনা করিতেছে। তখন উক্ত ধীবরেরা রাসমণির নিকট করুণস্বরে সমস্তই বিবৃত করিল। রাসমণি আদেশ করিলেন, "তোমরা সকলে অদ্য বাটী গমন কর, আমি যেরূপে হউক এ বিষয়ের সুচারু উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আগামী কল্যই তোমাদিগকে জ্ঞাত করাইব; তোমাদের কাহাকেও আর কষ্ট করিয়া আসিতে হইবেক না। তোমরা ব্যস্ত হইও না। যাহা কিছু লাগিবেক আমিই তোমাদের সাহায্য করিব। এই কথা প্রকাশ করাতে সমস্ত ধীবরেরা হস্তোত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাসমণি কিছুক্ষণ পরে জামাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "তাহাদের যে প্রকারে হউক আমি সাহায্য করিব। মাসিক কত ট্যাক্স লাগিবেক, ও কি নিয়মাবলী হইয়াছে, আপিসে গিয়া সমস্ত অবগত হইয়া আইস। তদনুসারে তৎক্ষণাৎ একজন কর্ম্মচারী আপিসে প্রেরিত হইল। কর্ম্মচারী আপিস হইতে প্রত্যাগত হইলে রাসমণি তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী একে একে প্রত্যেক বিষয় জ্ঞাত করাইলে রাসমণি বলিলেন, কল্য আপিসে

যাইয়া, কাশীপুর হইতে মেটেব্রুজ পর্য্যন্ত সমস্ত নদী, যত টাকা লাগিবেক, জমা করিয়া আসিবে,কোনওমতে যেন অন্যথা না হয়। রাসমণির আদেশক্রমে পরদিবস কয়েকটী আমলা আপিসে গিয়া, উক্ত সমস্ত স্থান বাৎসরিক ১০ হাজার টাকায় জমা করিয়া আসিল। রাসমণি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তথাকার পাট্টা লিখিয়া রেজিষ্টরী করিয়া লইলেন। কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, রাসমণি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতানুসারে,একদিবস আদেশ করিলেন,নদীতে অদ্য কোন জাহাজ, ষ্টীমার কিংবা অন্য কিছুই যাইতে দিও না। বোয়ায় বোয়ায় লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করিয়া যাতায়াতের পথ রুদ্ধ কর। রিবার পুলিসের দারগা আসিলেন, রাসমণির লোকেরা সকলে ভয়ে রাসমণির নিকট আগমন করিয়া এতদ্‌বিষয় জ্ঞাত করায় রাসমণি উত্তর করিলেন, জাহাজ ষ্টিমার প্রভৃতি নদীর ভিতর দিয়া গেলে সমস্ত মৎস্য পলায়ন করিযা যায়। মৎস্য ধরিবার বড় অসুবিধা হয়। অতএব এত খাজানা আমি কোথায় পাইব। এবং কিরূপেইবা দিব। পুলিশের লোকেরা শুনিলনা। রাসমণি এই বিষয় লইয়া মকর্দ্দমা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী রাসমনি গবর্ণমেণ্টে পুনঃ পুনঃ এই ট্যাক্সের জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট আর নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে না পারিয়া গঙ্গার জলকর রহিত করিলেন। এই মোকর্দ্দমায় রাসমণি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সেই জন্য সমস্ত ধীবরেরা গীত রচনা করিয়া রাসমণির নাম পথে ঘাটে প্রচার করিতে লাগিল।

রাসমণি, এখন আপন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার জামাতৃত্রয়ই সমস্ত কার্য্য দেখিতেন সত্য বটে, কিন্তু সকল সময়ে, সর্ব্বকার্য্যে, তাঁহার মত ভিন্ন কিছুই হইত না। কোনও জামাতা কোনও সময়ে কোনও বিষয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, অন্য জামাতাকে সেই ভার অর্পণ করিতেন। এইরূপে রাসমণি, মন্ত্রীত্ব পরিবর্ত্তন করিতেন বলিয়া, কাহারও অসন্তোষের কারণ হইত না। যিনি সুচারুরূপে কার্য্যসমাধা করিতে পারিতেন, তিনিই বেশী দিন মন্ত্রী থাকিতেন। এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া রাসমণি নিতান্ত বুদ্ধিমতীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এখন ক্রমে ক্রমে বিষয়াদি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বেলেঘাটা, ভবানীপুর, সোনাই প্রভৃতি স্থানে বাজার ক্রয় করিয়া, আপন নামানুসারে তাহাদের নাম রাখিলেন। ভবিষ্যতে, জামাতারা, এই সমস্ত স্থান লইয়া বিবাদ না করে এই নিমিত্ত সমস্তই আপন নামে করিতেন।

রাসমণি কালীঘাটে প্রায়ই স্নান করিতে যাইতেন। তথায় থাকিবার অসুবিধা দেখিয়া একটী ঘাট ও বাগান বাটী প্রস্তুত করিতে মানস করিয়া, কালীবাটীর সন্নিকটে একটি স্থান দেখিয়া, ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। রাসমণি, এই স্থানে প্রায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন যদি কেহ, কোনও মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন আত্মীয় লইয়া, গঙ্গাযাত্রার জন্য ঐ বাটীতে থাকিতে প্রার্থনা করিত, রাসমণি অকাতরে অনুমতি করিতেন।

এইরূপে কিছু দিনান্তে, রাসমণি, আপন জন্মভূমি দেখিতে মানস করিলেন। বিবাহের পর তিনি যদিও অনেক দিন, বাটী দেখিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন; রাজচন্দ্র যাইতে দেন নাই। এখন রাসমণি, পরাধীনা নহেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, তাহাই সম্পাদিত হইতে লাগিল। একদিন জামাতৃত্রয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি পিত্রালয় দেখিতে যাইব, অতএব শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হও।" ঠিক সেই সময়ে ত্রিবেণীর স্নান। রাসমণি বাল্যকালে পিতৃদেবের সহিত একবার ঐ ত্রিবেণীর স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর স্নানের কথা শ্রবণ করিয়া রাসমণি বলিলেন, "এই উদ্যোগে একবার ত্রিবেণী যাইব"। বিস্তর অর্থ, বস্ত্র, চাউল, ডাল লইয়া রাসমণি, দাস-দাসীতে পরিবেষ্টিতা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে চলিলেন।

পিতৃদেব না থাকায়, বাটীর ঘর দরজা কিছুই ছিল না। রাস-মনি, এই জন্য বাসোপযুক্ত কয়েক খানা গৃহ নির্ম্মাণার্থ পূর্ব্বেই অনেক লোক পাঠাইয়াছিলেন। বাটী প্রস্তুত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তিনি বজ্‌রায় আরোহণ করিলেন; যথাসময়ে নৌকা হালি-সহরের ঘাটে উপস্থিত হইল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরে তিনি হালিসহরে আসিলেন। শৈশবাবস্থায় যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার এখন কিছুই নাই। যখন শুনিলেন তাঁহাদের ঘাটে নৌকা লাগিল, রাসমণি পিতৃপিতামহদের উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণ করিয়া, কিছুক্ষণ পরে নিম্নে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নাম শুনিয়া সহস্র সহস্র উপায়হীন দরিদ্রের সমাগম হইল; রাসমণি প্রত্যেককে এক এক

খানা বস্ত্র ও একএকটী রৌপ্যমুদ্রা ও কিছু খাদ্য দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। বাটিতে গিয়া পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান করিয়া একে২ সকলের সহিত আলাপ করিলেন। প্রত্যেককে এক এক খানা রস্ত্র ও যথোপযুক্ত অর্থ দান করিলেন। এই রূপে সমস্ত গ্রাম আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। রাসমণি একদিন মাত্র বাটিতে থাকিয়া পর দিবস ত্রিবেণী স্নান করিতে গিয়া, বিস্তর অর্থ দান করিলেন। পরদিবস পুনরায় বাটিতে আসিয়া মহোৎসবের উদ্যোগ করিতে আদেশ দিলেন। মহাসমারোহের সহিত মহোৎসব সমাধা করিয়া,হালিসহরে একটি ঘাট প্রস্তুত করিবার সূত্রপাত করিলেন।

তৎপর দিবস কলিকাতায় আসিলেন। এই অবধি রাসমণি প্রায় প্রতি বৎসর ত্রিবেণীর স্নান করিতে যাইতেন। দ্বিতীয়বার স্নান করিতে যাইয়া, হালিসহরের ঘাট উৎসর্গ করিলেন। কিছুদিন গত হইলে রাসমণি নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। অনেক লোকজন সমভিব্যাহারে তিনি মহা সমারোহের সহিত নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া,চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, উপায় হীন দরিদ্র দিগকে বিস্তর অর্থ দান করিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে অনেক সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। রাসমণি কয়েকটী অধ্যাপককে ডাকিয়া প্রকাশ করিলেন, "আমি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিতে অভিলাষ করি।"অধ্যাপকেরা আত্মগৌরব রক্ষার্থে লইতে অস্বীকৃত হইলেন ও বলিলেন, "আমরা শূদ্রের

দান গ্রহণ করি না ; তাহাতে আপনি কৈবর্ত্তরমণী, আপনার দান গ্রহণ করিতে পারি না।” রাসমণি তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া, পাঁচশত গরদের ধুতি ও তদুত্তরীয় আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। রাসমণি এক এক যোড়া গরদের ধুতি ও এক একটি মোহর চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তখন দলে দলে ব্রাহ্মণেরা আগমন করিতে লাগিলেন; রাসমণিও সকলকেই সমান অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এখন ব্রাহ্মণেরা হস্তোত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রাজার দান লইলে, দোষ স্পর্শে না। তথায় তিন দিবস অবস্থিতির পর রাসমণি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

তীর্থ পর্য্যটনে রাসমণির মন এখন সমধিক আকৃষ্ট হইল। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তৎকালে শ্রীক্ষেত্র যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা থাকায়, রাসমণি সাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কি করিবেন অনেক বিবেচনা করিয়া, বাহকদিগকে পাল্কী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। অন্যান্য লোকে পদব্রজে যাইবেন, আর তিনি নিজে পাল্কী আরোহণে যাইবেন, ইহা অন্যায় বিবেচনা করিয়া,জামাতৃবর্গকে বলিলেন, “আমার সমভিব্যহারে যত লোক যাইবে সকলই পাল্কীতে যাইবে”। তদনুসারে বিংশতি পাল্কী আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। যথাসময়ে বাহকেরা পাল্কী আনয়ন করিল রাসমণি বিস্তর লোকজন সমভিব্যাহারে লইয়া,পুণ্যক্ষেত্র দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। অনেক দাস দাসী দরয়ান যাওয়াতে পথে ভারি সমা-

রোহ হইয়াছিল। তৎকালে দস্যুর ভয় প্রবল থাকায় রাসমণি অতি সতর্ক থাকিতেন। বাহক দিগের সাতিশয় কষ্ট না হয়, এই জন্য প্রতিদিন চারি পাঁচ ক্রোশের অধিক যাইতেন না। সুবিধামত পথ না থাকায় যাওয়ার কালীন সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। পৌঁছিয়া দেখিলেন, তথায় ভাল রাস্তা নাই, যাতায়াতের বড় কষ্ট। রাসমণি সুবর্ণরেখার অপর পার্শ্বে পৌঁছিয়া আদেশ করিলেন, "এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর ভাল রাস্তা না থাকে, সমস্ত স্থানে একটি সুবিস্তীর্ণ রাস্তা করিয়া দেও, যাওয়ার কালে যেন এই পথ দিয়া যাইতে পারি"। এই আদেশ দিয়া রাসমণি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিয়া, একপক্ষ পরে উপস্থিত হইলেন। দুঃখী দরিদ্র দিগকে বিস্তর অর্থ ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। বাটি হইতে তিনটী বড় ও কয়েকটী ক্ষুদ্র স্বর্ণ মুকুট লইয়া গিয়াছিলেন, রাসমণি স্বয়ং দণ্ডায়মানা হইয়া সেই সমস্ত জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে পরিধান করাইয়া, সেই দিবস তথায় যাবতীয় লোককে অন্ন বিতরণ করিলেন। পুরীতে জাতিভেদ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার নিতান্ত ইচ্ছা, এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া যাবজ্জীবন অতিবাহিত করি। পুরীতে গিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত আহার করিয়া, অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যত স্থান দর্শন করিয়াছি, পুরীর ন্যায় স্থান কোথায়ও দেখি নাই। তথায় তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া, তিনি নূতন রাস্তা দিয়া, ন্যূনাধিক দুই মাসের মধ্যে বাটি পৌঁছিলেন। আসিবার কালে জগন্নাথ দেবের সেবার্থ সহস্র

মুদ্রা দান করিয়া আসিয়াছিলেন। রাসমণি কোনও তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দুঃখী দরিদ্র দিগকে আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইয়া যথোচিত অর্থ ও বস্ত্র দান করিতেন।

বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া, রাসমণি ৫।৬ মাস কাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া, গঙ্গাসাগর যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। গঙ্গাসাগর স্নানের দিবস আগত প্রায় দেখিয়া, ভাল ভাল বোট আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি বোটে আরোপণ করা হইলে রাসমণি নৌকারোহণ করিলেন। পাঁচ ছয় খানা নৌকা, পাল্কি ও বেহারা সঙ্গে সঙ্গে ছিল। রাসমণি যে নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, তাহার মাঝীরা পুরস্কারের লোভে কায়মনোবাক্যে নৌকা বাহিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য সমস্ত নৌকা পশ্চাৎ রাখিয়া রাসমণির নৌকা অগ্রসর হইল। আগামী কল্য সকালেই স্নানের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, রাসমণি বেগে বাহিতে আদেশ করিলেন। নৌকা ক্রমে হাজিপুর (ডায়মণ্ড হারবার) অতিক্রমণ করিয়া সাগরাভিমুখে যাইতে লাগিল। রাসমণি কখন কোনও বড় নদী দেখেন নাই, অদ্য সাগর দেখিয়া উল্লাসিতা হইলেন। সঙ্গীদের নৌকা সমস্ত প্রায় দেড় কিংবা দুই ঘণ্টা পশ্চাৎ পড়িয়াছে। রাসমণি বলিলেন অন্যান্য নৌকা আসিলে তীর ত্যাগ করিব। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাতাস বহিতে লাগিল। সাগর হিল্লোল দেখিয়া, রাসমণির মনে ভয়ের উদয় হইল। নৌকায় থাক

পরামর্শ সিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া, বাহকদিগকে পাল্কী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। একজন দ্বারপাল ও দুইজন সহচরী সঙ্গে লইয়া তীরে অবতীর্ণা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া সাগর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদের জন্য কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, বায়ু সমধিক প্রবল হইতে লাগিল। তখন রাসমণি নিকটে একটী আশ্রয় স্থান দেখিতে আদেশ করিলেন। দরওয়ান অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। রাসমণি পাল্কী আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ২ চলিলেন। সমুদ্রতীর হইতে অনেক দূরে কয়েকখানা কুটীর দেখিয়া,রাসমণির শৈশব অবস্থা মনে পড়িল। কুটীর সন্নিকটে গিয়া রাসমণি শুনিলেন, ইহা একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আবাস স্থান। ব্রাহ্মণ, বাটীতে অতিথির আগমন দেখিয়া, সাদরে গ্রহণ করিয়া, রাসমণির থাকিবার জন্য একখানা গৃহ দিলেন। তিনি আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে সামান্য কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ মাতা ও ভার্য্যা,বাটিতে কয়েকটী স্ত্রীলোকের সমাগম শুনিয়া, দেখিতে আসিল। রাসমণি তাহাদিগকে সমাদরে নিকটে বসাইলেন, ও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাটিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দাস দাসীকে আপন নাম অপ্রকাশ রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন; সুতরাং বাটির গৃহস্থেরা যখন রাসমণির নাম শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিল,কলিকাতার কোন ভদ্র মহিলা গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে আসিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী ও তদীয়া পুত্রবধূ “রাণীরাসমণির” নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের বাটিতে

তাঁহার যে সমাগম হইবে ইহা অসম্ভব, সুতরাং তাহা এক বারও মনে উদয় হইল না। তাহারা ভাবিল অন্য কোন স্ত্রীলোক হইবে। রাসমণি তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাহাদের সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা একে স্ত্রীলোক, তাহাতে দরিদ্রাবস্থাপন্না। রাসমণি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,একে একে সরল চিত্তে সমস্ত বলিল। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখ করিয়া অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা শান্ত্বনা করিলেন। রাসমণি কোটীশ্বরী হইয়াও বলিলেন,ধনে আমাদের সুখহ্রাস ভিন্ন সুখবৃদ্ধি হয় না। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, ধনী হইলে ভাবিতে ভাবিতে অস্থি চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া যায়, মনে সুখের লেশমাত্র থাকে, না। রাসমণি এইরূপে তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন। এরূপে দুই প্রহর রাত্রি অতীত হইলে,তিনি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বিদায় হইবার সময়ে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও তদীয়া পুত্রবধূকে একশত মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। নৌকারোহণ করিয়া দেখিলেন, সমস্ত নৌকা আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। তখন অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। নৌকা যথাস্থানে লাগিল। রাসমণি নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া যথাসময়ে স্নান করিয়া দীনদরিদ্রদিগকে অর্থ ও বস্ত্র দান করিয়া বাটি প্রত্যাগমন করিলেন। রাসমণি তাঁহার জীবদ্দশায় ২।৩ বার গঙ্গাসাগর গিয়াছিলেন।

বঙ্গোপসাগর হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া রাসমণি এক মহতী ব্রতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। এতদ্দেশীয় যাবতীয়

তীর্থ দর্শন করিয়া, এখন তিনি মোক্ষধাম বারাণসীক্ষেত্র দর্শন করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কেবল বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইয়াছিল। নৌকা ভিন্ন পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার অন্য কোনও উপায় ছিলনা। সে সময়ে বারাণসী ক্ষেত্র যাইতে হইলে, বাটি ও বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে একরূপ চির-বিদায় লইয়া যাইতে হইত। এদেশ হইতে যত যাত্রী তথায় বৎসর বৎসর গমন করিত, শতকরা ১০।১২টি প্রত্যাগমন করিত কিনা, সন্দেহ। অর্থ থাকিলে কিসের ভয়? রাসমণি, তীর্থযাত্রোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পঞ্চবিংশতি উত্তম উত্তম বজরা আনয়ন করিয়া, ছয় মাসের আহারীয় যাবতীয় সামগ্রী নৌকাজাত করিতে বলিলেন। বলিলে অত্যুক্তি বোধ হইবে, কিন্তু যিনি রাসমণিকে দেখিয়াছেন, ও যিনি তাঁহার কার্য্য প্রণালী ও মনোভাব বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার দানশীলতা পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য ও সৌজন্যতা স্বীকার করিবেন। পাছে পথিমধ্যে সকলের কষ্ট হয়, এই ভয়ে রাসমণি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই লইতে আদেশ দিলেন। শুনিলে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, রাসমণি আদেশ করিলেন, আমার সমভিব্যাহারে যত লোক যাইবে, কাহার যেন কোনও বিষয়ে কষ্ট হয় না, এই জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নৌকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।

উত্তম চাউল	২	দাসদাসীগণের ও অন্যান্যসকলের	
বালাম চাউল	২	জল খাবার	২

তৈল লবণ ডালইত্যাদি ...	১	আত্মীয় কুটম্ব	২
আমার নিজের থাকিবার ...	১	কুটম্বিনী	৪
বড় জামাতা	১	ধোপা	১
মেজো জামাতা	১	সাধারণ ভাণ্ডার	১
আমলাদের	২	চারিটা গাভির	১
শান্তিরক্ষা দরয়ান	২	বিছালী	১
ডাক্তার ও ঔষধালয় ...	১		

মোক্ষধাম বারাণসী দর্শন করিবার সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত। এই সময়ে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে দিন দিন অসংখ্য লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। রাসমণি, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী রওনা হইবার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,যেন বিশ্বেশ্বর তদীয় পত্নী সমভিব্যাহারে মানবমূর্ত্তি ধারণ করত ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়া,তাঁহাকে অনাথা দরিদ্রদিগকে অন্ন দান করিতে বলিতেছেন। সেই রমণীমূর্ত্তি যেন তাঁহাকে বলিল, এই সময়ে বারাণসী যাওয়া পরিত্যাগ কর। গঙ্গাতীরে আমাদের অন্যতর কালী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, প্রতিষ্ঠা কর। রাসমণি এবম্বিধ স্বপ্ন দেখিয়া, পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, স্বপ্নের বিষয় সহচরী দিগকে বলিয়া প্রকাশ করিলেন,এবার বারাণসী যাওয়া হইবেক না। যদি বাঁচিয়া থাকি,ভবিষ্যতে অন্য সময়ে যাইব। এতদ্বিষয় ঘোষণা করিয়া জামাতাদিগকে বলিলেন, যে সমস্ত দ্রব্য নৌকারোহণ করা হইয়াছে, তাহা আর বাটিতে আনয়ন করা না হয়। কল্য সকালে আমি গঙ্গায় স্নান করিতে যাইব, সেই সময়ে সমস্ত অন্নপূর্ণা দেবীকে উৎসর্গ করিয়া

দিব। তদনন্তর অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবে। পর দিবস যথাক্রমে সমস্তই বিতরিত হইল। স্বপ্ন দর্শনাবধি রাসমণির মনে এক অদ্ভুত তদ্ভাবের উদয় হইয়াছিল। তিনি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিতে মানস করিয়া তৃতীয় জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত পরামর্শ করিলেন। মথুরামোহন নিতান্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূদেবীর এবম্বিধ মহতী মতি দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিয়া, বলিলেন আমি স্বয়ং উপযুক্ত স্থান দেখিতে গমন করিব। রাসমণি, মথুরের একাগ্রচিত্ততা ও উদ্যোগ দেখিয়া,কয়েকটি আমলা ও মথুরকে প্রেরণ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা কলিকাতার সন্নিকট ভাগারথী তীরবর্ত্তি দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট মেগাজিনের সংমিলিত একটি স্থান ক্রয় করিলেন। রাসমণি ঐ স্থান ক্রয় করিয়া শুভ দিনে শুভক্ষণে অতি জাঁক জমকের সহিত স্বয়ং তথায় যাইয়া স্বহস্তে দেবালয়ের সূত্রপাত করিলেন। সূত্রপাত করা হইলে নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়,ও সাতক্ষীরার পূজ্যতম প্রাণনাথ চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারেরা তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিলেন। রাসমণি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সহিত মোকর্দ্দমা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যখন তাঁহাদের পরস্পার অত্যন্ত বিবাদ চলিতে ছিল তখন একদিন রামরতন বাবু রাসমণিকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি স্ত্রীলোক হইয়া এত বাড়াবাড়ি কেন করিতেছেন? স্ত্রীলোকের এতদূর প্রতিজ্ঞা ভাল নয়। রাসমণি এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।

"রতন বাবুর এটি ভারি ভ্রম, তিনি জানেন না, এ সংসারে স্ত্রীলোকেরই ক্ষমতা বেশী। তিনি জানেন না, শক্তি নিজেই স্ত্রী মহাবীর শম্ভু নিশম্ভু স্ত্রীলোকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন! আমি স্ত্রীলোক হইলে ক্ষতি কি? তাঁহাদের ক্ষমতা থাকে আমার নিকট হইতে লউন। রাসমণি গম্ভীর ভাবে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মনে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অধ্য-বসায় ছিল, যে কিছুতেই তিনি হতাশা হইতেন না। মোক-দ্দমায় জয়লাভ করিয়া দেবালয় প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ইহা প্রস্তুত করিতে তাঁহার বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। দেবালয় প্রস্তুত হইলে কালীমূর্ত্তির অবিকল প্রতি-রূপ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। যথাসময়ে সমস্ত সম্পন্ন হইলে রাসমণি প্রতিষ্ঠার দিবস নির্দ্ধারণার্থ নবদ্বীপের সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিতকে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর আসিতে প্রথমে অনেক আপত্তি উত্থাপন করায় রাসমণি বলিয়া পাঠাইলেন, উহাঁ কে আনয়ন করিতে যত টাকা লাগিবেক সমস্তই দিব, যাহাতে আনিতে পার সেই চেষ্টা করিবে। অর্থে কিনা হয়? পণ্ডিতবর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তৎক্ষণাৎ রাসমণির বাটিতে আগমন করিয়া শুভ দিন নির্দ্ধা-রণ করিলেন।

১২৬২ সালে স্নানযাত্রার দিন শুভ দিবস দেখিয়া রাসমণি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে মানস করিলেন। শুভ দিনে দেবা-লয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার প্রায় নব লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই দেবা-

লয় প্রস্তুত করিবার সময় রাসমণি অর্থকে অ র্থ জ্ঞান করেন নাই। এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের এমন কি ময়মানসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কনৌজ,বারাণসী ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় ও বিদ্যা বুদ্ধি ও যশঃ অনুসারে সকলকেই বিদায় করিয়াছিলেন। একটি মোহরের ন্যূন কাহাকেও দান করেন নাই। এবং প্রত্যেককেই চেলী ও গরদের পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাসমণি নিস্তব্ধ ছিলেন না। তিনি যাহা করিতেন তাহা কখনই অঙ্গহীন থাকিত না! দেবালয়টি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সময়ে জেলা রংপুর ও দিনাজপুরের অন্তর্গত সালবাড়িয়া নামক একটি পরগণা লাটে উঠে; রাসমণি সুবিধা বুঝিয়া ত্রৈলক্যমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকায় তাহা ক্রয় করিয়া, বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবালয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। এবং এই মর্ম্মে এক খানা উইল প্রকটন করিলেন যে, আমার উত্তরাধিকারী গণের মধ্যে যে কেহ ইহার সেবায় শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহই ইহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এবং সেই দিন হইতে ইহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন। উইল নামা রীতি মত রেজিষ্টারী করিয়া সমস্ত দৃঢ়িভূত করিলেন। এই মহৎ কীর্ত্তিতে রাসমণির নাম আর ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় নীলকর সাহেবদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহাদের সহায় থাকায় তাহারাই হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। কেহই সাহস করিয়া কিছুই করিতে পারিত না। এই নররাক্ষসদের দৌরাত্মে মানীদের মান, ধনীদের ধন, ও যশস্বীদের যশঃ কিছুই রক্ষা পাইত না। নীলকরের উৎপাতে প্রজারা দেশ ত্যাগ করিতে লাগিল। পাবনা, যশোহর, রংপুর, ফরিদপুর অঞ্চলের লোকেরা সমধিক প্রপীড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করত ধনীদের আশ্রয় লইতে লাগিল। রাসমণির মকিমপুরস্থ অনেক প্রজা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়া, সমস্ত কষ্ট জানাইল। প্রজা বৎসলা রাসমণি তাহাদিগকে পরগণার সদর কাচারীতে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া প্রায় ৫০ জন দরয়ান পাঠাইয়া দিলেন। তখন তিনি পরগণার প্রধান নায়েবের নিকট এই পত্র লিখিলেন। "পরস্পার শ্রবণ করিতেছি নীলকর সাহেবেরা আমার প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে, তোমরা কেন এত দিন সরকারে সমাচার দেও নাই। সম্প্রতি ৫০ জন দরয়ান প্রেরণ করিতেছি, যাহাতে কোনওরূপ গোলমাল না হয়, করিবে। প্রজা, পুত্র সম। উহাদের কষ্ট আমার সহ্য হইবেক না। যাহাতে তাহারা উৎপীড়িত না হয়, যাহাতে নীলকর সাহেবরা জব্দ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে, কোনওরূপ শৈথিল্য দেখিলে অন্যায় হইবে।" প্রয়োজনীয় পত্র হইলে রাসমণি নিজেই স্বহস্তে

স্বাক্ষর করিতেন। এই পত্র তাৎকালিক নায়েব বনমালী ঘোষের হস্তে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি সমস্ত প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও বলিয়া দিলেন নীলকর সাহেবেরা যদি বলপূর্ব্বক নীলের দাদন দিতে আইসে, লইবেক না। যদি বেশী ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে, আমার নিকট আসিবে। যাহা করিতে হয় আমি করিব। রাসমণির ও তদীয় কর্ম্মচারীর অনুমতি পাইয়া প্রজারা দৃঢ় পরিকর হইল। তাহারা কেহই নীলের দাদন গ্রহণ করিল না। নীলকর সাহেবেরা ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বয়ং মফঃস্বলে প্রজাদের নিকট আসিতে লাগিল। কিছুতেই তাহারা সম্মত না হওয়ায়, সাহেবেরা বল প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রধান নায়েব হুকুম দিলেন যে সাহেব আসিবেক, সমুচিত শাস্তি দিবেক। যত টাকা লাগিবেক সরকার হইতে দিব। হুকুম পাইয়া প্রজারা ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল। নীলকর ডোলাল্ড সাহেব যেমন তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে, অমনি তাহারা তাহাকে ও তাহার আমলাদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিল। সাহেব মৃতপ্রায় হইলেন। মোকর্দ্দমা ক্রমে যশোহর প্রধান মাজিষ্ট্রেট সমীপে আসিল। রাসমণি কলিকাতা হইতে বড় বড় দুইজন বারিষ্টার ও উকীল পাঠাইয়া দিলেন। অনেক অর্থ ব্যয়ের পর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। সেই অবধি আর নীলকর সাহেবেরা অধিক উৎপাত করিত না। ভবিষ্যতে আর কোন

গোলযোগ না হয় এই আশঙ্কায় বনমালী ঘোষ মকিমপুরের নিকট একটী পুলিষ ফাঁড়ি প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। অবিলম্বে ফাঁড়ি হইল। তাহা অদ্যাবধি সমভাবে আছে।

মকিমপুর পরগণায় মধুমতী নামক একটী সুবিস্তীর্ণ নদী আছে। অন্যান্য নদীর সহিত সম্মিলিত না থাকায় বাণিজ্যের অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় প্রজারা সকলে সমবেত হইয়া রাসমণির নিকট আবেদন করিল। তদনুসারে তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ও জরিপ আমিন প্রেরণ করিয়া, মধুমতী ও নবগঙ্গা নদীর সহিত খাল কাটিয়া সম্মিলন করিতে অনুরোধ করিয়া, বলিলেন "কোন্ স্থানে খাল খনন করিলে সাধারণের উপকার হইবে ও তাহাতেই বা কত অর্থ ব্যয় হইবে এতদ্বিষয়ের একটী ফর্দ্দ শাস্ত্র পাঠাইবে। যথাসময়ে উক্ত কর্ম্মচারীরা যথাদেশ এক তালিকা প্রেরণ করিলেন। ইহাতে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রার উল্লেখ ছিল। রাসমণি মকিমপুরের সদর নায়েবের প্রতি ঐ টাকা দিতে আদেশ করিলেন। এই খাল "টোনার খাল" নামে প্রসিদ্ধ। উহা কি শীত কি গ্রীষ্ম সর্ব্বকালেই বেগবতী থাকে। এখন লোকে মহাসুখে বাণিজ্যতরী লইয়া বাণিজ্য করিতেছে।*

এই সময়ে রাসমণির চতুর্থ জামাতা বিশেষ পারদর্শী ও সুচতুর মথুরামোহন বিশ্বাস সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত

* "Rani Rasmoni cut a half mile khal to goin Bankana (Nava Ganga) with the Madhumati at Tona". Jessore Report.

ছিলেন। রাসমণি মথুরকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। মথুর অজস্র ব্যয় করিতেন; কিছুই ভাবিতেন না। এইরূপে দুই বৎসর রাসমণি কিছুই দেখিলেন না। সমস্তই মথুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় বৎসর অতীত হইলে রাসমণি মথুরকে সমস্ত হিসাব দিতে আদেশ করিলেন। মথুর ভাবিলেন স্ত্রীলোককে যেন তেন প্রকারেণ বুঝাইয়া দিবেন; কিন্তু রাসমণি সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি মথুরের সমস্ত চতুরতা বুঝিতে পারিয়া মহা তদ্বির আরম্ভ করিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মথুর ভয়ে বাটি ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ফরাশডাঙ্গা পলায়ন করিলেন। রাসমণি অনেক অনুসন্ধানের পর জ্ঞাত হইলেন তাহারা ফরাশডাঙ্গায় বাস করিতেছেন। রাসমণি এরূপ ন্যায়পরায়ণা ছিলেন যে, আপন জামাতা বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না। তিনি অন্যায় দেখিতে পারিতেন না এবং যে কেহ হউক না কেন কাহাকেও অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে,তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা কন্যা ও জামাতাকে না দেখিয়া অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া, তিনি তিন চারি বার তাহাদিগকে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। মথুর ভয়ে প্রত্যাগমন করিলেন না। এরূপে এক বৎসর প্রায় গত হইল। এমন সময়ে রাসমণি ত্রিবেণীর স্নান করিতে গমন করিলেন। আসিবার কালে ফরাশডাঙ্গায় নৌকা লাগাইতে আদেশ করিয়া শিবিকা আরোহণে মথুরের বাটীতে গমন করিলেন।

মথুর ও তদীয় স্ত্রী বিশেষ করিয়া বলাতে রাসমণি তাহাদের সমস্ত দোষ ক্ষমা করিলেন।

বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া রাসমণি লোকপরম্পরায় জ্ঞাত হইলেন, তাঁহার কৃষ্ণকান্ত নামক একটি উড়িয়া ভৃত্য, সৌদামিনী নাম্নী পরিচারিকার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তখন রাসমনি তাহাদিগকে একে একে আহ্বান করিয়া তাহাদের মনের ভাব জ্ঞাত হইয়া, তাহাদিগকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিয়া, বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বলিতেছি, ইহাতে তোমরা সুখী হইবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কোন দিন বিবাদ হয়, তাহা হইলে প্রকৃত দোষীকে যথোচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যত দিন রাসমণি জীবিতা ছিলেন, তত দিন তাহারা সুখে তাঁহার সেবায় রত থাকিয়া কালাতিপাত করিয়াছিল; রাসমণির মৃত্যুর পর তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়া সন্তানাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। রাসমণি এইরূপ উচ্চমনাই ছিলেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। যাহাতে দেশের, সমাজের, সংসারের কুশল হয়, সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তিনি তাহা বেশ বুঝিতেন। সে জন্য আপন পরিচারক ও পরিচারিকাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। এই সমস্তই তাহা হইতে সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না। রাসমণি এই দম্পতীকে স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাই করিল। তিনি গোপনে থাকিয়া সমস্ত দেখিলেন ও

করিলেন। তিনি অনেক সময়ে গোপনে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। অন্যে কিছুই জানিতে পারে নাই।

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে বিখ্যাত ভয়াবহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নগরের প্রত্যেক প্রধান স্থানে সৈন্য আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে উদ্যত। অনেকে রাসমণিকে সমস্ত কাগজ বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিল। রাসমণি রঞ্জিত সিংহের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন "সিপাইদের কুবুদ্ধি মাত্র; আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সব লাল হোয়েগা।" রাসমণি আপনার কাগজ বিক্রয় না করিয়া বরং আরও অনেক ক্রয় করিলেন। বিদ্রোহানল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতার অনেক বড় বড় লোক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলেন। রাসমণিও ৬টী হস্তী ও বিস্তর খাদ্য ও অর্থ সাহায্য করিলেন।

ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট রাসমণিকে এক খানা প্রসংশা পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বিদ্রোহানল প্রবল তর হইতে লাগিল। সকলই ভয়ে ব্যস্ত। কলিকতায় নিয়ম হইল ৪টার পরে কেহ দোকান খোলা রাখিতে পারিবে না। জানবাজার, দুর্গের অতি সন্নিকট বলিয়া তথাকার লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপীড়িত হইত। এক দিবস অপরাহ্নে রাসমণির দৌহিত্রেরা আপন আপন বয়স্য সমভিব্যাহারে বারেন্দায় উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে কয়েকজন

গোরা ফ্রি স্কুল হইতে বাহির হইয়া, রাসমণির বাটির সম্মুখস্থ কয়েকখানা দোকানে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। উক্ত দোকানদারেরা মহা ভীত হইয়া বারেন্দাস্থিত বাবুদের শরণাগত হইল। রাসমণির দৌহিত্র যদুনাথ, ও দ্বারিকানাথ আপন দরয়ান দিগকে আদেশ করিলেন। "দুরাত্মাদিগকে তাড়াইয়া দেও"। এই কথা শ্রবণ মাত্র মহা গোলমাল উপস্থিত হইল। জানবাজারস্থ অনেক দোকানদারও উক্ত দরয়ানেরা একত্র হইয়া যষ্টি প্রহার করিয়া দুরাত্মা গোরা দিগকে তাড়াইয়া দিল। গোরারা প্রহার বেদনায় কাতর হইয়া ফ্রি স্কুলস্থিত আপনাদের কর্ণেলকে সমস্ত বিষয় বিদিত করায় কর্ণেল রাগান্ধ হইয়া এক রেজিমেণ্ট (দল) সৈন্যকে ত্বরায় সজ্জিত হইতে অনুমতি করিলেন।

৫॥টার সময়ে এক দল সৈন্য আসিয়া রাসমণির বাটি বেষ্টন করিল। দ্বারপালেরা ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিল। এদিকে সন্ধ্যা আগত প্রায়। গোরারা কৌশল পূর্ব্বক কপাট ভগ্ন করিল। এতদ্দর্শনে বাটির দাস দাসী সকলই পলায়ন তৎপর হইল। অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীরা ভয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এমন সময়ে কয়েক জন দরয়ান ও বাবুরা বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাটির পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী একটি বাটিতে প্রেরণ করিলেন। সকলই রাসমণিকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি কোন মতেই আপন গৃহ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বয়ং কতকগুলি চাবি ও

এক খানা তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া আপন গৃহে বসিয়া রহিলেন। গোরারা বাটি প্রবেশ করিয়া নিম্নের কয়েকটি বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠন ও যাবতীয় দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এক জন ভৃত্য পলায়ন করিতে না পারিয়া প্রাণ ভয়ে কোচের ও অন্য এক জন তক্তপোষের নিম্নে লুক্কায়িত হইয়াছিল পামরেরা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া তরবারি আঘাত করিল। ক্রমে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির নিকটবর্ত্তী বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি নষ্ট করিতেছে, ইত্যবসরে কর্ণেলের বিগিল-শব্দ শুনিয়া গোরারা একত্রিত হইল।

অপরাহ্নে মথুরামোহন আপন চ্যারিয়টে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটির সন্নিকট গোরাদিগকে দেখিয়া থানায় গিয়া সমস্ত জ্ঞাত করাইলেন। তৎক্ষণাৎ ইন্‌স্পেক্‌টর, সার্জ্জন অনেকে আগমন পূর্ব্বক কর্ণেলকে বলিল, এ বাটিতে যদি বিদ্রোহী থাকে আমরা এখনই ধরিয়া দিব, আপনারা প্রত্যাবর্ত্তন করুন। তদনুসারে কর্ণেল বিগিল ধ্বনি করিলে সৈন্যেরা প্রতিনিবৃত্ত হইল। মথুরামোহন ও কয়েক জন ইনেস্পেক্টর ও সার্জ্জন বাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাটিতে কাহাকেও না পাওয়াতে তাহারা রিপোর্ট করিল এখানে কোন বিদ্রোহী প্রাপ্ত হইলাম না। ক্রমে সকলেই প্রত্যাগমন করিল। রাসমণি আদেশ করিলেন, যাবৎ কাল বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত না হয়, তাবৎ ১২ জন গোরা আমার দ্বার

রক্ষা করিবে। সেই দিন হইতে দুর্গ হইতে বার জন ইংরাজ সৈন্য আসিল। রাসমণি তাহাদিগকে প্রায় দুই বৎসর আপন গৃহদ্বারে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। বাটির গোলমাল শমিত হইলে রাসমণি স্বয়ং মথুরামোহনকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া সমস্ত গৃহ পর্য্যটন করিলেন। দ্রব্যাদি ভগ্ন দেখিয়া তিনি ব্যথিত অন্তঃকরণে বলিলেন ইহার সমুচিত শাস্তি না দিয়া ক্ষান্ত হইব না। তৎপরে আহত ভৃত্যদ্বয়কে দেখিয়া সকরুণ হৃদয়ে আপনি নিজ হস্তে তাহাদের ক্ষতস্থান বন্ধন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাসমণি পামরদিগের যথোচিত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইয়া তৎপর দিবস সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিবার মানসে, মাজিষ্ট্রেটে নালিশ করিলেন। তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হইল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া রাসমণি জয়লাভ করিলেন।

বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে কিছু দিন পরে ইন্‌কাম ট্যাক্স নামক একটী কর নির্দ্ধারিত হয়। এই ট্যাক্সের নাম শ্রবণ করিলে এখনও শোণিত শুষ্ক ও রোমাঞ্চিত হয়। এই কর-গ্রহণকারীদের পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া প্রজারা হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা রাসমণির নিকট অহরহ আবেদন করায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে অনুমতি প্রাদন করিলেন। এ দিকে তিনি আপন অধিকারস্থ প্রত্যেক পরগণার সদর নায়েবের উপর এই হুকুম করিলেন যে, এই কর গ্রহণকারীরা যাহাতে আমার প্রজা-দিগের উপর কোন অত্যাচার করিতে না পারে তদ্বিষয়ে

মনোযোগী হইবে। নায়েবেরা এসেসরদের পীড়নে কাতর প্রজাদের দুঃখ বিমোচনার্থে রাসমণির নিকট বারংবার নিবেদন করিতে লাগিল। রাসমণি তখন অনন্যোপায় হইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার প্রজাদের সাম্বৎসরিক যত টাকা ট্যাক্স লাগিবেক, সমস্ত আপাততঃ আমার নিজ তহবিল হইতে দান কর ; পরে প্রজাদিগের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে আদায় করিও। রাসমণির এতাদৃশ কৃপা দেখিয়া প্রজারা তাঁহার একান্ত বশীভূত হইল ও দেশ বিদেশে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপে স্বামীর মৃত্যুর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পরে ১২৬৭ সালে ফাল্গুন মাসে ভয়ানক উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি ও সর্ব্বকনিষ্ঠা জগদম্বা ও অনেক দৌহিত্র ও দৌহিত্রী এবং জামাতৃত্রয় রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।*

---

* "Pritram was succeeded by his son Raj Chandra and he by his widow Rasmoni Dasi commonly known as Rani Rasmoni. She died a few years since, and the Zemindari is now held by Padmamani Dasi and Jagadumba Dasi, daughters of Rasmoni, whose interest, however, only lasts for their lives. The family possess large estates in Rungpore Zillah, and also in the 24 Perganahs, and they are known, from the place of their residence, as the Jan Bazar zemindars.

Pritram and Raj Chandra both of them built several houses in the English quarter of Calcutta, which their descendants still own. Rani Rasmoni built and endowed at great expense a temple called the "Navaratna" (nine jewels) which is a mile or two north of Calcutta."

J. Westland's Jessore Report.

রাসমণি একটী রমণী রত্ন। তাঁহার উদার চরিত, সদানন্দচিত্ত, ও অমায়িকতা, দেখিলে সদ্বংশজাতা ও অসামান্যা বিদুষী বলিয়া বোধ হইত। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেন; তৎপরেই একজন ব্রাহ্মণের মুখাবলোকন করিয়া তাহাকে একটী মুদ্রা প্রদান করিয়া একশত আট্‌টি দুর্গানাম লিখিতেন।

এইরূপে ক্রমে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিয়া, দুই তিন ঘণ্টা কাল বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ আপন দৌহিত্র প্রমুখাৎ দৈনিক সংবাদ পত্র শ্রবণ করিতেন। তদনন্তর স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক দীন দরিদ্রদিগকে দ্বাদশ মুদ্রা দান করিয়া ৩।৪টার সময়ে হবিষ্য ভোজন করিতেন। পরে সায়ংকালে তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া আত্মীয় কুটুম্বিনী ও আপন দৌহিত্রী দৌহিত্র দিগের সহিত সমবেত হইয়া সংবাদ পত্র শ্রবণ ও তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন। সন্তান সন্ততিদিগের সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন। দাস দাসী সকলেরই সমভাবে তত্ত্বাবধান করিতেন। এক দিন তাহাদের কাহাকেও না দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া অদর্শনের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। বাটিতে কাহার অসুখ হইলে তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কখনও কাহার প্রতি রুষ্ট হইতেন না।

মনুষ্য-জীবন ধারণ করিলেই মরিতে হয়; মৃত্যু কাহারও হস্তাধীন নয়, কাহারও কথা শুনে না। সময় উপস্থিত হইলে

রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলকেই শমন ভবনে যাইতে হইবে, সকলকেই মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতে হইবে। কিছুই চিরস্থায়ী নহে! কিছুই সঙ্গে যাইবে না। মনুষ্য-জীবনের সুখই ধর্ম্ম এবং তাহাই অসহায়ের সহায়; নির্ধনীর প্রকৃত ধন। "এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।" মনুষ্য-জীবন কখনই সম্পূর্ণ পবিত্র হইতে পারে না। দুর্লভ মানব জীবন ধারণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাসমণি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহার যশঃ কীর্ত্তি সমস্ত বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আজ ঊনবিংশতি বৎসর গত হইল তথাচ রাসমণির নাম এখন অনেক লোকের, অনেক পরিবারের, অনেক সমাজের, সাধারণ বিষয়, আলাপের ও কথায় প্রসঙ্গ হইয়া আছে। আজ কাল যেমন সর্ব্ব সাধারণে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে "রাজা" "মহারাজা" "রায় বাহাদুর" "সি এস আই" ইত্যাদি জাঁকাল উপাধি ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন না, রাসমণির সেরূপ ছিল না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়া, এক দিনও ঐরূপ নাম ক্রয় করিবার অভিলাষ করেন নাই। তাঁহার গুণ, ঔদার্য্য ও প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া তাঁহার প্রজারাই তাঁহাকে "রাণী" উপাধি দিয়াছিল। গুণ থাকিলে আর উপাধি ক্রয় করিতে হয় না। ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্মের পুরস্কার। কথিত আছে, কোনও সময়ে কোনও একটি মোকর্দ্দমায় কমিসনার সাহেব রাসমণির বাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন,, আপনি কাহার নিকট "রাণী" উপাধি পাইয়াছেন? প্রত্যুৎপন্নমতি রাসমণি বলিলেন "আমার প্রজারাই ভক্তি স্বরূপ আমাকে উহা প্রদান করিয়াছে।" রাসমণি যথার্থ কথাই বলিয়াছিলেন।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

রাসমণির মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যাদ্বয় পদ্মমণি দাসী ও জগদম্বা দাসী তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। কিছুকাল দুই ভগিনী একত্র থাকিয়া জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কত দিন আর তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় থাকিবেক? সর্ব্বানিষ্টমূল অর্থ তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ক্রমে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নির্ব্বাণ হইবার আর কোন উপায় রহিল না। এই সময়ে মথুরামোহন কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তিনি নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ১২৭০ সালে দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে ধান্যাচল উৎসর্গ করিয়া অনেক দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। মথুরামোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী জগদম্বা দাসী পুত্রত্রয় লইয়া সমস্ত কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রাসমণির জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রসিদ্ধ দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীকে আপন বাটির সংশ্লিষ্ট এক বাটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া যান। যদুর মাতা রাসমণির জীবিতাবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করায়, হিন্দু—লা অনুসারে তিনি (যদু) সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হন। রাসমণি যদুকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন।

তাঁহারই বুদ্ধিবলে রাসমণি এতদূর যশস্বিনী হইয়াছেন। রাসমণি যদুকে এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, কেবল নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সেই যদু আপন দোষে স্বীয় মাতামহীর জীবিতাবস্থায় কিছুই সংস্থান করিয়া রাখিতে পারেন নাই। রাসমণির মৃত্যুর পর মাতৃস্বস্থ পুত্রদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় বাটি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

যদুর পিতা অদ্যাবধি জীবিত আছেন। যদুর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। এত বড় বৃহৎ পরিবার লইয়া যদু অন্নাভাবে শীর্ণকায় হইয়াছেন। তাঁহার আর সে বুদ্ধি নাই, তেজ নাই। এখন পরান্নভোজী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ধন্য রে ল !! ধন্য রে কৈবর্ত্ত জাতি !!!

১২৮০ সালে জগদম্বা দাসীর তৃতীয় পুত্র ঠাকুর দাস বিশ্বাস এক মাত্র পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।

১২৮১ সালে রাসমণির তৃতীয় কন্যাসুত ভূপালচন্দ্র বিশ্বাস তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ভূপাল দয়া দাক্ষিণ্য নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিমাতা তাঁহাকে যে কত কষ্ট দিয়াছেন, বলা যায় না। ভূপাল কেবল আপন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুণে সমস্ত সহ্য করিয়া ধৈর্য্য গুণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্তানেরা মাতামহ দত্ত বিষয় পাইয়া খিদিরপুরে বাস করিতেছেন। ঐ সালে রাসমণির প্রথম জামাতা স্বীয় পত্নী ও তিন পুত্র এক কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রামচন্দ্র দাস অতিশয় ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

১২৮২ সালে জগদম্বা দাসী স্বীয় মাতার অনুসারিণী হইয়া মহা সমারোহের সহিত বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট পার্কের দক্ষিণে এক দেবালয় সংস্থাপন করিয়া স্বীয় নাম চিরস্থায়ী করিয়াছেন। ইহা প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

১২৮৪ সালের পৌষ মাসে ৮ দ্বারকানাথ বিশ্বাস আত্মীয় স্বজনকে দুঃখ সাগরে মগ্ন করিয়া তিন পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস আপন দশম বর্ষীয়া স্ত্রী রাখিয়া মানবলীলা পরিহার করিয়াছেন।

রাগিণী জংলা আলেয়া। তাল—কাওয়ালী।

(রাণী) রাসমণি সামান্য নারী কে বলে, হেন নাই এ মহীতলে।
রাজ্যে আছে অধিক ধনী, কে হইয়াছে হেন দানী
পূণ্য হল ধরণী—রাসমণির পূণ্য বলে ॥
কীর্ত্তি-র্যস্য স জীবতি, দক্ষিণেশ্বরে স্থিতি
ছিল তার যথার্থ ভক্তি, শক্তির পদতলে।
পুরাইতে মনোরথ করেছেন রজতের রথ,
আলোকরে রাজপথ, রাসমণির রথ যায় চলে ॥
সার্থক তাঁর বিষয়, দেশ বিদেশে দেবালয়,
বাবুঘাট লোকে কয়, হের চাঁদপালে।
নিমতলার গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রি থাকিবারে দিয়াছেন ঘর করে,
ব্যয় করে অবহেলে।
ইন্দ্রতুল্য তিন জামাতা, তিনের সমক্ষমতা,
বিষয়ে নহে ন্যূনতা দাতা ভোক্তা সকলে।
কন্যা লক্ষ্মী স্বরস্বতী, অষ্টবসু অষ্ট নাতী,
রূপে গুণে রতিপতি বিদ্যাবুদ্ধি কৌশলে।
অমূল্য অতুল ঐশ্বর্য্য, বিষয়ের কে করে ধার্য্য,
এ রাজ্যে রাসমণি পূজ্য, শান্তমতি সুশীলে।
শালীয়ানা যত আয়, সমুদায় করে ব্যয়,
পল্লে লোকের দায়াদায় হুকুম করেন তহবিলে।
দাস রাজার বংশে জন্ম, কল্লেন নানা ধর্ম্মকর্ম্ম,
সুখে কাটাইয়া আজন্ম, সজ্ঞানে গঙ্গাপেলে।
এসেছিলেন দ্বারকানাথ, করিতে বিষয় হাত,
বাক্য শুনিয়া নির্ঘাত লাজে বদন লুকালে।
হেরিয়া রাসমনির দম্ভ লেগে গেল ভূমি কম্প,
কোথা গেল লম্ফ ঝম্ফ হেটবদনে পলালে।

সভাস্থ ভদ্রসন্তান, সকলে করে সম্মান,
করিতেন অন্নদান অকাতরে সকলে।
সরকারে কেহ নাহি দুখী, অন্নবস্ত্রে সবে সুখী,
চাপি বেড়ায় ঘোড়া পাল্কী, কহিছে খগপালে ॥